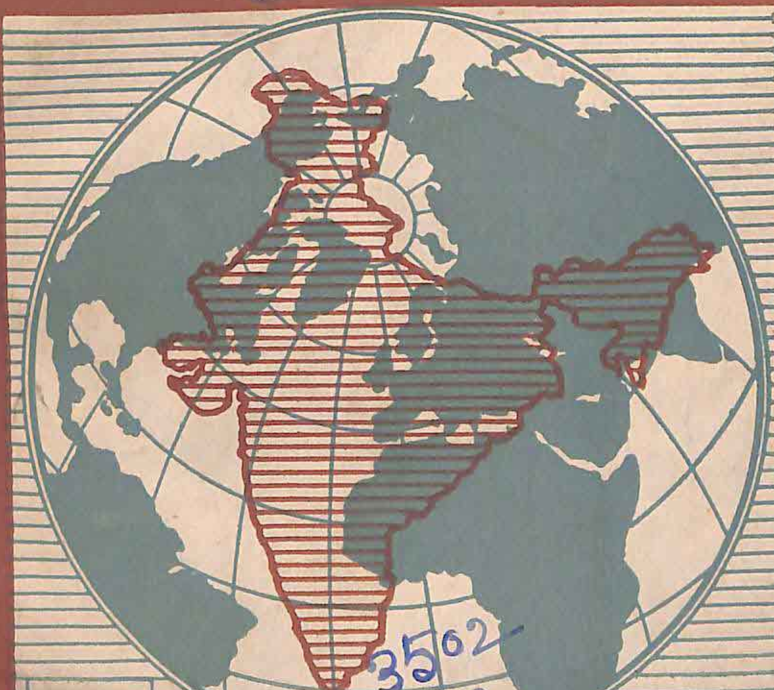
মাধ্যমিক ভূগোল



১ম ভাগ

শ্রী নবনীধর দাস

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক ১৯৭৪ সালের স্থিরীকৃত নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য লিখিত।

মাধ্যমিক ভূগোল

(প্রথম ভাগ)

[ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য]

শ্রীনবনীধর দাস, এম. এ., বি. এস্-সি., বি. টি.
ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল ;
ভূতপূর্ব স্টেট এডুকেশন ইভ্যালুয়েশন অফিসার,
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ
কলিকাতা।

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
10, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-12

প্রকাশক :
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪

মূল্য—২ টাকা ৮০ পয়সা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শংকর প্রিণ্টার্স
২৭।৩বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

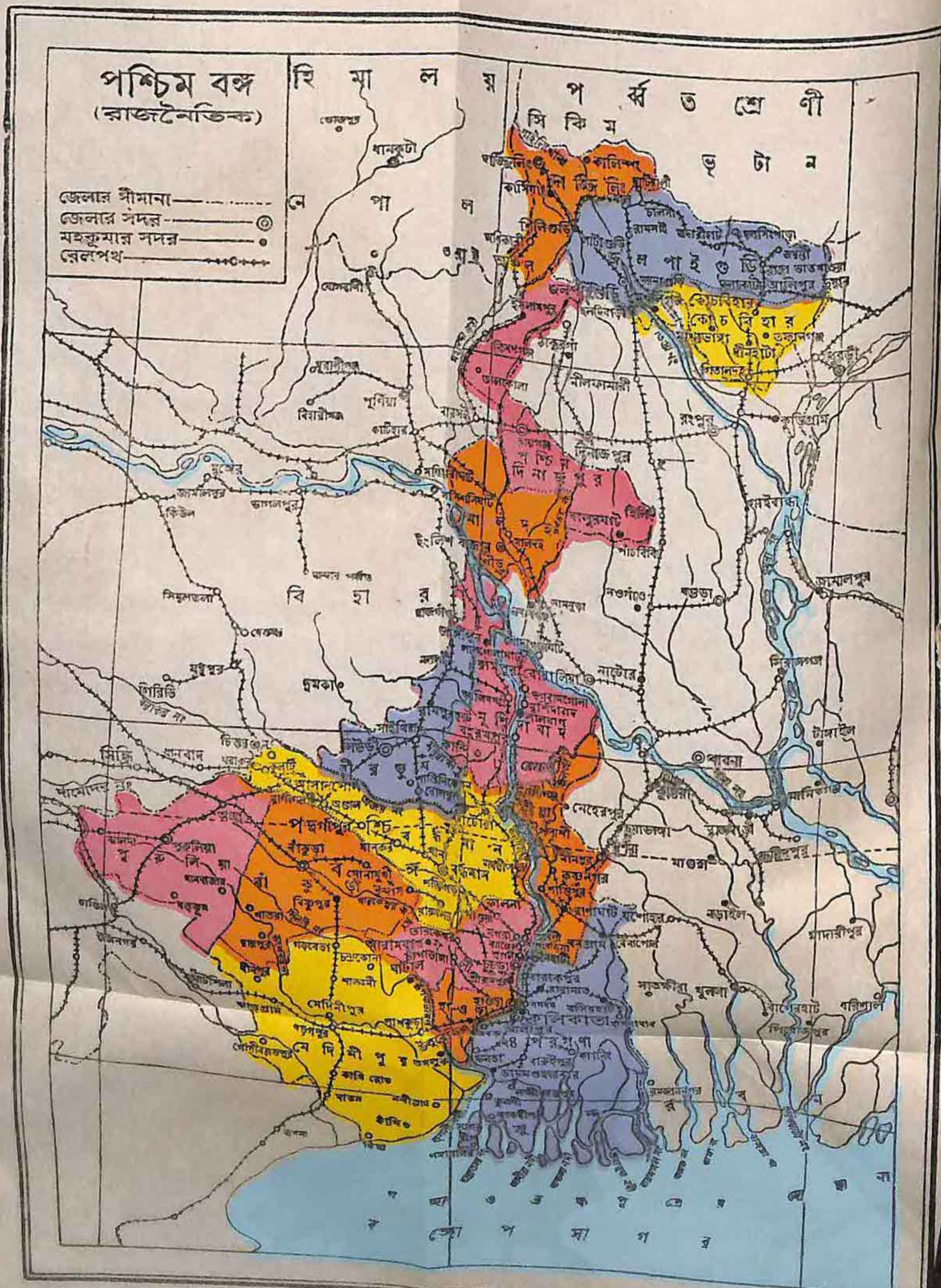
পুস্তকের সামগ্রিক পরিচিতি হিসাবে ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভূগোলের নূতন পাঠ্যসূচীতে বাঙ্গালীর, বাঙ্গালার ও বাঙ্গলাভাষাভাষীদের পরিচয় বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট যে অপরিহার্য, এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী স্বাগত ও অভিনন্দনযোগ্য। আশা করি, ইহাতে শিক্ষার্থীদের সুস্থ মননশীলতা ও চিন্তার নূতন দিক্‌বলয় উন্মোচিত হইবে।

জাতীয় সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যসূচী-নির্দেশিত দৃষ্টিকোণ হইতে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করিয়া মাধ্যমিক ভূগোল লিখিত হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারে লাগিলে আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। পরিশেষে লিখি, এই পুস্তকের উন্নতিকল্পে যে-কোন সৃষ্টিধর্মী অভিভাব (constructive suggestion) কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

১৮. ১২. '৭৩
কলিকাতা

গ্রন্থকার

সূচীপত্র



পশ্চিম বঙ্গ
(রাজনৈতিক)
জেলার সীমানা
জেলার সদর
মহকুমার সদর
রেলপথ
হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী
সিকিম
ভূটান
নেপাল
বিহার
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
পশ্চিম দিনাজপুর
মালদহ
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
বর্দ্ধমান
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
মেদিনীপুর
হাওড়া
কলিকাতা
২৪ পরগণা
বঙ্গোপসাগর

মাধ্যমিক ভূগোল

প্রথম ভাগ

উপক্রমণিকা

1947 সালের 15ই আগষ্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের সঙ্গে ভারতভাগের যে দৈবদুর্বিপাক দেশকে গ্রাস করে তাহার আঘাত যেন বঙ্গদেশকেই বেশী অভিভূত করে। ভারতবর্ষ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানে ভাগ হইবার সঙ্গে বঙ্গদেশ পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তান (বা পূর্ববঙ্গ, অধুনা বাংলাদেশ) এই দুই রাজ্যে বিভক্ত হয়। রাজনৈতিক কারণে বঙ্গদেশ বিভক্ত হইলেও, বাঙালীর ভৌগোলিক সীমা বিভিন্ন হইলেও ভাষাগত ঐক্যের জন্য উহাদের কৃষ্টির কোন বিচ্ছেদ হয় নাই। আজ বাংলাদেশ এক স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বাংলা তাহার রাষ্ট্রীয় ভাষা। এই ভাষার আকর্ষণেই পদ্মার এপার-ওপার বাংলা সাংস্কৃতিক ঐক্যে পরস্পরকে যেন হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ অভিন্ন; কিন্তু তবু যেন ভিন্ন। জাতীয়তার ভিত্তিতে আমরা প্রথমে ভারতবাসী, কিন্তু আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে, স্বাতন্ত্র্যে আমরা বাঙালী এই আমাদের পরিচয়। আমাদের আচার-ব্যবহার, খাদ্য, বেশভূষা, বাসস্থান, জীবিকা সব কিছুতেই আমরা ভারত রাষ্ট্রের অন্যান্য জাতি হইতে যে পৃথক তাহা অস্বীকার করা যায় না। মহামতি গোখলে একদিন বাঙালী প্রতিভার প্রশংসা করিয়া যে বলিয়াছিলেন,'What Bengal thinks

today, India will think tomorrow,'—বাংলা আজ যাহা চিন্তা করে ভারতবর্ষ আগামী কাল তাহা চিন্তা করিবে। বর্তমানে ঐকথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, যুগপরিবর্তন সত্ত্বেও বাঙালীর মনীষা আজও যে ভারতে স্বীকৃত ও সম্মানিত তাহা অনস্বীকার্য। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর বাঙালী আবার জাগ্রত, তাহার পূর্বতন স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য জীবনযুদ্ধে লিপ্ত! তবে তাহার জীবনে সমস্যাও কম জটিল নয়। ভারতবিভাগের অব্যবহিত পূর্ব হইতে জলস্রোতের ন্যায় পূর্ববঙ্গ হইতে অগণিত উদ্বাস্তুর আগমনে গণজীবন একরূপ বিপর্যস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণিত হইয়াছে; কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধাও সীমিত; তাই সমগ্র ভারতরাষ্ট্রে শিক্ষিত বেকার যুবকদের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে সর্বাপেক্ষা বেশী; ভূমির উপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি হইয়াছে —এক কথায় সেদিনের (ভারতবিভাগের সময়) রাজনৈতিক সঙ্কট আজ অর্থনৈতিক সঙ্কটে পরিণত হইয়াছে। ভারতবিভাগের ফলে পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশ সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুরা দিল্লী ও তাহার সন্নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে স্বাধীন উপার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; তাঁহারা উদ্যোগী, আজ তাঁহারা আর উদ্বাস্তু নাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে আজও সে সুদিন আসে নাই, এখানে এখনও উদ্বাস্তু শিবির দেখা যায়। এতৎসত্ত্বেও মনে হয় 'দিন আগত ঐ'; পশ্চিমবঙ্গবাসী আবার নিজেকে জীবনে যথাযথ প্রতিষ্ঠিত করিবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

1. পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী—তাহাদের খাদ্য, বেশভূষা, আবাস ও জীবিকা (The inhabitants of West Bengal —Their food, dress, shelter and occupation)

পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগকে বাঙালী বলা হয়। বঙ্গভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা—তাই তাঁহারা, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই বাঙালী।

ভৌগোলিক পরিবেশে মানুষের জীবনধারার কাহিনীই ভূগোলের আলোচ্য বিষয়বস্তু। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া পশ্চিমবঙ্গবাসী সকলকেই বাঙালী বলা কতখানি সঙ্গত তাহা ভাবিবার বিষয়। নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তিতে বিশ্বকবির অমৃত লেখনীতে বাংলার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—

> 'নমোনমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি—
> গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
> অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি—
> ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।'

তাহা গ্রাম বাংলার চিত্র। কিন্তু শিল্পের প্রসারের জন্য এবং অর্থনৈতিক কারণেও দুর্গাপুর-আসানসোলের মত শিল্পনগরী ও কলিকাতার মত শহরাঞ্চলে সেই কৃষ্টি আজ যেন অনেক পরিবর্তিত। উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের নানাস্থান হইতে ভারতীয়রা জীবিকার সন্ধানে বা অন্য কোন কারণে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া শিল্পাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে যেন সর্বভারতীয় সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছেন—এই স্থানগুলি যেন ভারতীয় কৃষ্টির প্রতীক। সেইজন্য 'পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী' বলিতে সমস্যা যত জটিল, অন্য কোন রাজ্যের পক্ষে তাহা

সেরূপ নহে—এখানে মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী প্রভৃতিকে লইয়া একটি যেন আন্তর্ভারতীয় সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তাই তাঁহাদের কথাও বলা প্রয়োজন। তবে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পুরুষানুক্রমে* পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারাও আজ বাঙালী বলিলে অন্যায় হয় না। পশ্চিমবঙ্গ আজ তাঁহাদের নিকট পরভূমি নয়, স্বভূমি।

বঙ্গভূমির প্রাচীন ঐশ্বর্যের ও ঐতিহ্যের যে খ্যাতি ছিল, আজ তাহা লুপ্তপ্রায়, তবু বাঙালী নিঃশেষ হয় নাই। নবসভ্যতায় সে নূতন উদ্দীপনায় আত্মপ্রতিষ্ঠায় সদ্য জাগ্রত—প্রাচীনতার সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া সে আজ বিশ্বপ্রাঙ্গণে নূতনত্বের সন্ধানে ব্যাপৃত। দেশের ও দেশের বাহিরে পৃথিবীর যেখানে যাহা কিছু ভাল সব সে আজ আত্মসাৎ করিতেছে। তাই তাহার আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার, বেশ-ভূষা অধিকাংশক্ষেত্রেই যেন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন স্থরু হইয়াছে। এই বিশাল পরিবর্তনের যুগে যাঁহারা আজও প্রাচীন সংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে, এবং দূর-গ্রামাঞ্চলে কোন অনগ্রসর স্থানে যেখানে আজও শিক্ষা, সভ্যতা বিশেষ গতি পায় নাই, সেখানে বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে ; নতুবা, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এক নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ আজ উন্নতির মুখে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সংস্কৃতি 'মহামানবের মিলনে' সে এক মিশ্র সভ্যতা ও সংস্কৃতি, যাহার ভবিষ্যৎসম্ভাবনা উজ্জ্বল।

শিক্ষিত সমাজের ইহাই সাধারণ চিত্র। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী বলিতে শুধু শিক্ষিত সমাজকেই বুঝায় না। শিক্ষিতের

---

* সম্প্রতি গভর্ণমেন্টের নিয়মানুযায়ী (রেডিও সংবাদে) যাঁহারা এদেশে ক্রমাগত দশ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এদেশের অধিবাসী বলিয়া গণ্য করা হয়।

হারও এখানে খুব বেশী নহে, মাত্র শতকরা 33·5 জন শিক্ষিত, সর্ব-ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের স্থান অনেক নীচে, এবং শিক্ষিত বলিতে উচ্চ শিক্ষা হইতে অক্ষর-জ্ঞান আছে এইরূপ সকল ব্যক্তিকেই বুঝায়। নিরক্ষরতা জগদ্দল পাথরের মত দেশের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে—অনগ্রসর শ্রেণীর ব্যক্তিগণ, আদিবাসী সাঁওতাল প্রভৃতি অনেকে আজও সেই অন্ধকারেই আছেন; জ্ঞানের দীপবর্তিকা তাঁহাদের মনের দরজায় এখনও পোঁছায় নাই। কে না চায় যে, তাঁহার সন্তান-সন্ততি কিছু লেখাপড়া শিখুক! কিন্তু দারিদ্র্যই ইহার প্রধান প্রতিবন্ধক। অবশ্য খ্রীষ্টান মিশনারীদের দৌলতে নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহারা ধর্মান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কিছু শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে। শিক্ষার অভাব থাকিলে জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে, অগ্রগতিতে নিশ্চয়ই তাহা বাধা সৃষ্টি করিবে। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গে আরও শিক্ষার বিস্তার অত্যাবশ্যক এবং তাহা বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। রাজ্যসরকার অবশ্য শিক্ষার খাতে যথেষ্ট ব্যয়-বরাদ্দ করিয়াছেন; শিক্ষার প্রসারের চেষ্টাও করিতেছেন। তবে সেইসঙ্গে দারিদ্র্যের উৎখাত হওয়া প্রয়োজন। দারিদ্র্য এক অভিশাপ। যেদিন দেশ দারিদ্র্যমুক্ত হইবে, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে হাত ধরাধরি করিয়া দেশের সার্বিক উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হইবে, সমাজচেতনা অতি সহজভাবেই শিক্ষাকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিবে; তখন দেশে নব-জাগরণের প্রকৃত সূর্যোদয় হইবে। তখন পশ্চিমবঙ্গ জ্ঞানে-গুণে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, ধনে-মানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ আসন লবে'। জাতির ভবিষ্যৎ জাতির উপরেই নির্ভর করে এবং সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। তাঁহারা এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করিতেছেন এবং আশা করা যায়, অদূর

ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় সংস্কৃতিতে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করিবে।

1. 1. আমরা ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, আবাস এবং জীবিকা সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে আলোচনা করিব।

1. 1. 1. পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের খাদ্য (Food) : পশ্চিমবঙ্গের গণজীবনে যত পরিবর্তনই হউক না কেন, খাদ্য নির্বাচনে সে আজও অন্নবিলাসী। কিছুকাল পূর্বের বাংলার যে চিত্র পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় তখন ঘরে ঘরে ছিল গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, আর গোয়ালভরা গরু। তাই প্রাচীনকাল হইতেই বাঙালীর খাদ্যতালিকায় ভাত, মাছ ও দুধের স্থান প্রথম। প্রচলিত প্রথায়, সন্তান-সন্ততি যাহাতে দুধ-ভাত খাইতে পায়, বাঙালী আগে এই বরই প্রার্থনা করিত। কিন্তু আজ ? কত পার্থক্য !

সোনার বাংলায় বাঙালী আজ ভাতের কাঙাল। বঙ্গবিভাগের ফলে, পূর্ব-পাকিস্তান (পূর্ববঙ্গ, বর্তমান বাংলাদেশ) হইতে উদ্বাস্তু আগমনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যা (বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় 4 কোটি 45 লক্ষ) এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এই অংশের সীমিত জমি হইতে উৎপন্ন চাউলে চাহিদা মেটান যায় না। ইহা ছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যথা ঝড়, খরা, বন্যা ইত্যাদি প্রতি বৎসর লাগিয়াই আছে। তাহার জন্যও ক্ষতি কম হয় না। ফলে পশ্চিমবঙ্গবাসী আজ খাদ্যের জন্য অন্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী। একমাত্র যাঁহাদের কিছু জায়গা-জমি আছে তাঁহারা ছাড়া যাঁহারা শহরাঞ্চলে বা শিল্পাঞ্চলে বাস করেন তাঁহাদের সকলেই যাহাতে কিছু খাইতে পান, তাহার জন্য রেশন ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। বিদেশ (আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি) হইতে গম আমদানী সম্ভব

বলিয়া, বিশেষতঃ সবুজ বিপ্লবের ফলে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় প্রচুর গম উৎপন্ন হয় বলিয়া রেশনে চাউলের অভাব গমের দ্বারা পূরণ করা হয়। সেইজন্য অবস্থার বিপর্যয়ে বাঙালীর এতদিনের অভ্যাসের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। বাঙালী আজ ভাত এবং রুটি দুই-ই খাইতে অভ্যস্ত। ইহাতে অবশ্য স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় নাই, কারণ খাদ্য হিসাবে গম অতি পুষ্টিকর।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে যাঁহারা এখানে আসিয়া বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা ভাত ও রুটি দুই-ই আহার করেন। এই হিসাবে তাঁহাদের সহিত বাঙালীদের প্রধান খাদ্যের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

তবে বাঙালীরা মাছ খায়, এ অভিযোগ অবশ্য অনেকেরই আছে। কিন্তু মাছ এখন দুর্মূল্য, সাধারণের নাগালের বাহিরে। অবিভক্ত বাংলায় পূর্ববাংলা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে মাছ আসিত; তারপর বঙ্গবিভাগের ফলে রাজনৈতিক কারণে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। এখন বাংলাদেশ স্বাধীনতালাভের পর এবং তাহাদের সহিত ভারতের সৌহার্দ্য থাকায় ভবিষ্যতে মাছের আমদানীর উন্নতি হইতে পারে; কিন্তু মাছ যে সস্তা ও সহজপ্রাপ্য হইবে তাহা দুরাশা। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাছের চাষ বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু লোকসংখ্যার অনুপাতে তাহা কতখানি সাফল্য-মণ্ডিত হইবে ভবিষ্যৎই একমাত্র তাহা বলিতে পারে।

ইহার পর দুধের কথা।—দুধ, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে, একরূপ দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতায় হরিণঘাটা ও বেলগাছিয়ায় সরকার পরিচালিত দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এবং দুর্গাপুর শিল্পনগরীতে অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। তবু তাহা প্রয়োজনের চাহিদায় যথেষ্ট

মনে হয় না। পূর্বের তুলনায় দেশের দুগ্ধের অবস্থার অবনতির কারণ জনসংখ্যার চাপ ও শিল্পবিস্তার। জনসংখ্যার চাপের দরুণ অনেক পতিত জমি বা গোচারণভূমি আজ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে এবং শিল্পবিস্তারের জন্য গোচারণের উদ্বৃত্তস্থান সীমাবদ্ধ। প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের অভাব মিটাইতে মাংসের পরেই মাছ ও দুধের মত উপযোগী আর কিছু নাই। দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার খাদ্য, পায়সান্ন ও মিষ্টান্নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রসিদ্ধ, কিন্তু এখন তাহা অর্থবানদের জন্যই নির্দিষ্ট। তাই, সবদিক বিবেচনা করিয়া, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য ও দুগ্ধের উন্নতির একান্ত প্রয়োজন।

এ যাবৎ বাঙালীর তিনটি প্রধান খাদ্যের কথাই আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা জানি, ভাত শুধু খাওয়া যায় না; ভাতের সঙ্গে ডাল (মুগ, মুশুরি প্রভৃতি) ও তরকারীর প্রয়োজন হয়। পশ্চিমবঙ্গে আলু, বেগুন, কপি, ঢ্যাড়স প্রভৃতি নানাপ্রকার শাক-সব্জি জন্মে, তবে ডাল সম্পর্কে রাজ্য স্বয়ংনির্ভর নহে—মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্য হইতে ডাল, সরিষা ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গকে আমদানী করিতে হয়। যাঁহারা মাছ-মাংস খান না, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই প্রত্যহ কিছু ডাল খাওয়া উচিত, কারণ তাহাতে প্রাণিজ প্রোটিনের অভাব উদ্ভিজ্জ প্রোটিন দ্বারা পূরণ হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, পশ্চিমবঙ্গেও সবুজ বিপ্লবের অভিযান চলিয়াছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ শস্য-উৎপাদন সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে। মনে হয়, তখন অন্ততঃপক্ষে প্রত্যেক বাঙালীরই 'শাক-ভাত'-এর সংস্থান হইবে, দু'বেলা পেট ভরিয়া তাঁহারা ভাত খাইতে পাইবেন।

1.1.2. পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ (Dress)ঃ বাঙালীর সাধারণ বেশভূষা বলিতে ধুতি-চাদরই বুঝায়,

তবে কালের পরিবর্তনে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর সাধারণ জাতীয় পরিচ্ছদ ধুতি-পাঞ্জাবী (বা সার্ট)-চাদর।

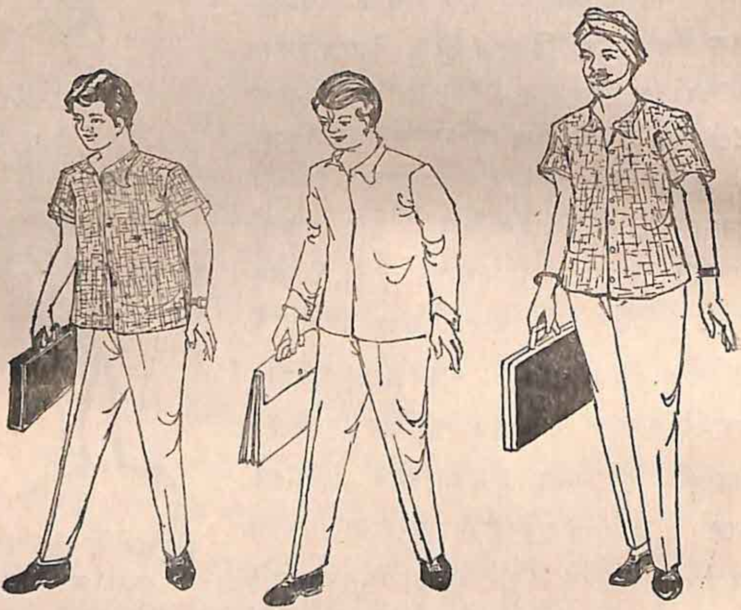
পূর্বে বলা হইয়াছে, যুগবিবর্তনে বাঙালী এক আন্তর্জাতিক মিশ্র সংস্কৃতির মধ্য দিয়া যাইতেছে। পোশাক-পরিচ্ছদে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গত দ্বিতীয় বিশ্বমহা-যুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকার বিশেষ ঘাঁটি এবং দ্বিতীয় রক্ষণরেখা (defence line) ছিল পশ্চিমবঙ্গ—কলিকাতা ও চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান। প্রসঙ্গতঃ, প্রথম রক্ষণরেখা ও ফ্রণ্টলাইন ছিল মণিপুর অঞ্চল, যেখানে নেতাজী পরিচালিত I.N.A.-এর সহিত ব্রিটিশ ও আমেরিকার সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধকালীন অবস্থায় আমেরিকার পোশাক-পরিচ্ছদ কর্মরত বাঙালী যুবকদের মনকে যেন প্রভাবিত করে। তাই যুদ্ধশেষে তাঁহারা চলিয়া গেলেও তাঁহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ—প্যাণ্ট ও বুশসার্ট—বাঙালী প্রায় সকলেরই সাধারণ বেশভূষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে ব্রিটিশ আমলে একমাত্র বড় বড় অফিসাররাই প্যাণ্ট-কোট পরিতেন, টাই বাঁধিতেন ; এখন ট্রামে, বাসে সর্বত্র প্রায় সকলেরই একইরূপ সাহেবী বেশভূষা। কেবল পার্থক্য টেরিলিন ইত্যাদি কাপড়ের মূল্য বিচারে। পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে আমরা যেন সাম্যনীতিতে বিশ্বাসী। কার্যে স্বচ্ছন্দগতি এবং অর্থনৈতিক কারণই ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী; কারণ একবার কোন প্রকারে প্যাণ্ট-বুশসার্ট করাইতে পারিলে বেশ



ধুতি-পাঞ্জাবী-চাদর পরিহিত বাঙালী ভদ্রলোক।

কিছুদিন চলে, কাচার ঝঞ্ঝাটও অনেক কম এবং বেশ ফিট্‌-ফাট্‌ থাকা চলে।

কিন্তু পূজা-পার্বণে কিংবা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা সাধারণতঃ ধুতি-পাঞ্জাবী ব্যবহার করি। তখন আমাদের জাতীয়



পোশাকে সাম্যনীতি : অনুরূপ পোশাক পরিহিত অফিসগামী বাঙালী, দক্ষিণ-ভারতীয় ও পশ্চিম-ভারতীয় (পাঞ্জাবী) ভদ্র ব্যক্তিগণ।

বৈশিষ্ট্যেই নিজেদের প্রকাশ করিবার স্বভাব জাগ্রত হয়। আমাদের এরূপ ঢিলা পোশাকের (loose dress-এর) বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চলের আবহাওয়া আর্দ্র-উষ্ণ, গ্রীষ্মে অত্যন্ত ঘাম হয় ও তাহা পীড়াদায়ক। এই অবস্থায় আঁটসাট পোশাক(tight dress) পরিলে তাহা আরও কষ্টকর হয়। কিন্তু ঢিলা পোশাকের উপযোগিতা এই যে, দেহ ও পোশাকের মধ্যবর্তী বায়ু—বায়ু যেহেতু

তাপের পক্ষে কুপরিবাহী—দেহকে বাহিরের উত্তাপ হইতে যেমন রক্ষা করে, তেমনই শরীরের তাপের সমতাও রক্ষা করিতে সাহায্য করে। সেইজন্য বাঙালীরা স্বভাবতঃ ঢিলা পোশাক পরিতে অভ্যস্ত; কিংবা, গ্রীষ্মকালে খালি গায়ে থাকিতে ভালবাসেন।

কৃষক, শ্রমিক সম্প্রদায় যাহারা মাঠে-ঘাটে পরিশ্রম করিয়া, কিংবা কল-কারখানায় কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁহারা কার্যের সময় সচরাচর ছোট কাপড় বা হাফ প্যাণ্ট এবং ফতুয়া বা গেঞ্জি ব্যবহার করেন। কিন্তু তাঁহাদেরও পোশাক-পরিচ্ছদ ধোয়া ধুতি-ফতুয়া-চাদর বা অবস্থার তারতম্যভেদে ধুতি-ফতুয়া ও কাঁধে গামছা বা ধুতি-গামছা, এমন কি কোথাও কোথাও পরনে শুধু ধুতি।

বাঙ্গালী মেয়েরা শাড়ী, সায়া, ব্লাউজ ইত্যাদি ব্যবহার করেন এবং সোনার অলঙ্কার ভালবাসেন।

অবাঙালী যাঁহারা নিজদিগকে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদেরও অফিস-পোশাক বাঙালী অফিসারদের মতই



স্বকীয় পোশাকে মাড়োয়ারী ভদ্রলোক।

সাহেবী পোশাক এবং বাড়িতে তাঁহারা বা মাড়োয়ারীরা গদীতে নিজের নিজের জাতীয় পোশাকই পরেন।

পশ্চিমবঙ্গের অনুন্নত অধিবাসী, আদিবাসী ও সাঁওতালদের কথাও

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগকে সাধারণতঃ দিনাজপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় অধিকসংখ্যায় দেখা যায়। খ্রীষ্টান মিশনারীদের দৌলতে বাঁকুড়ায় সাঁওতালদের মধ্যে কিছু কিছু শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, তবু অধিকাংশক্ষেত্রে ইহারা আরণ্যক পরিবেশে সহজ জীবনযাত্রা যাপন করিতেই যেন ভালবাসেন। তাঁহাদের বেশভূষা অতি সাধারণ।

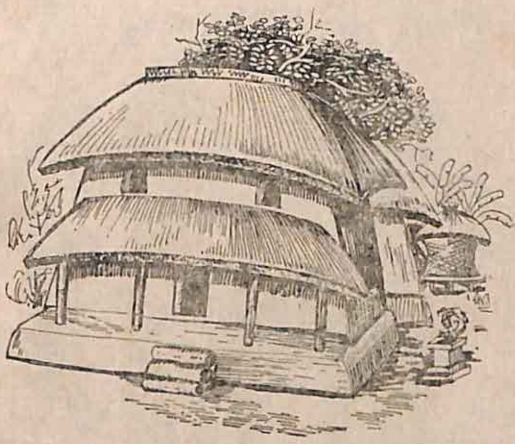
পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের বেশভূষা সমতল অঞ্চলে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের তুলনায় কিছু স্বতন্ত্র। পার্বত্য অঞ্চলে শীত বেশী, সেইজন্য প্রায়ই তাঁহাদের গরম পোশাক ব্যবহার করিতে হয়। সেখানেও পুরুষদের মধ্যে প্যাণ্ট-কোটের বা গরম পোশাকের ব্যবহারের প্রচলন আছে। তবে মেয়েরা নিজেদের হাতে তৈয়ারী স্কার্ফ ইত্যাদি ব্যবহার করেন। বেশী শীত অঞ্চলের অনেক পাহাড়িয়া শীতকালে শীতের প্রকোপে সমতলভূমি—জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে নামিয়া আসেন এবং সমস্ত শীতকাল অতিবাহিত করেন ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরিয়া যান।

1.1.3. পশ্চিমবঙ্গীয়দের আবাস বা বাসস্থান (Shelter) : শহরাঞ্চলে অধিবাসীরা ইটের দালান এবং গ্রামাঞ্চলে দালান ও মাটির কোঠাবাড়ি, খড়ের বা টিনের চাল (বা ছাউনি) এবং যাহারা গরীব তাঁহারা সচরাচর কুড়ে ঘরে বাস করেন।

ব্রিটিশ আমলে জমিদারীপ্রথার দিনে অর্থনৈতিক বৈষম্য এত উৎকট ছিল যে, অর্থবান জমিদারগণ বা রাজারাজড়া প্রাসাদোপম রাজঅট্টালিকায় বাস করিতেন, আর অন্যান্য সকলে তাঁহাদেরই মুখাপেক্ষী হইয়া দীন-দরিদ্রভাবে জীবন যাপন করিতেন। সেইজন্য জমিদার বা রাজা ব্যতীত অন্যান্য সকলের বাড়িঘরের অবস্থা বিশেষ

উল্লেখের মত কিছু ছিল না; তবে প্রত্যেকটি বাড়ি যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নিকানো-মোছানো এবং শ্রীমণ্ডিত ছিল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে এখনও একজন কৃষকের বাড়ি লক্ষ্য করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবে।

পশ্চিমবঙ্গে উগ্র আবহাওয়ায় খড়ের চালবিশিষ্ট মাটির কোঠা-বাড়ির বিশেষ উপযোগিতা আছে। এইরূপ বাড়ি যেন স্বভাবতঃ



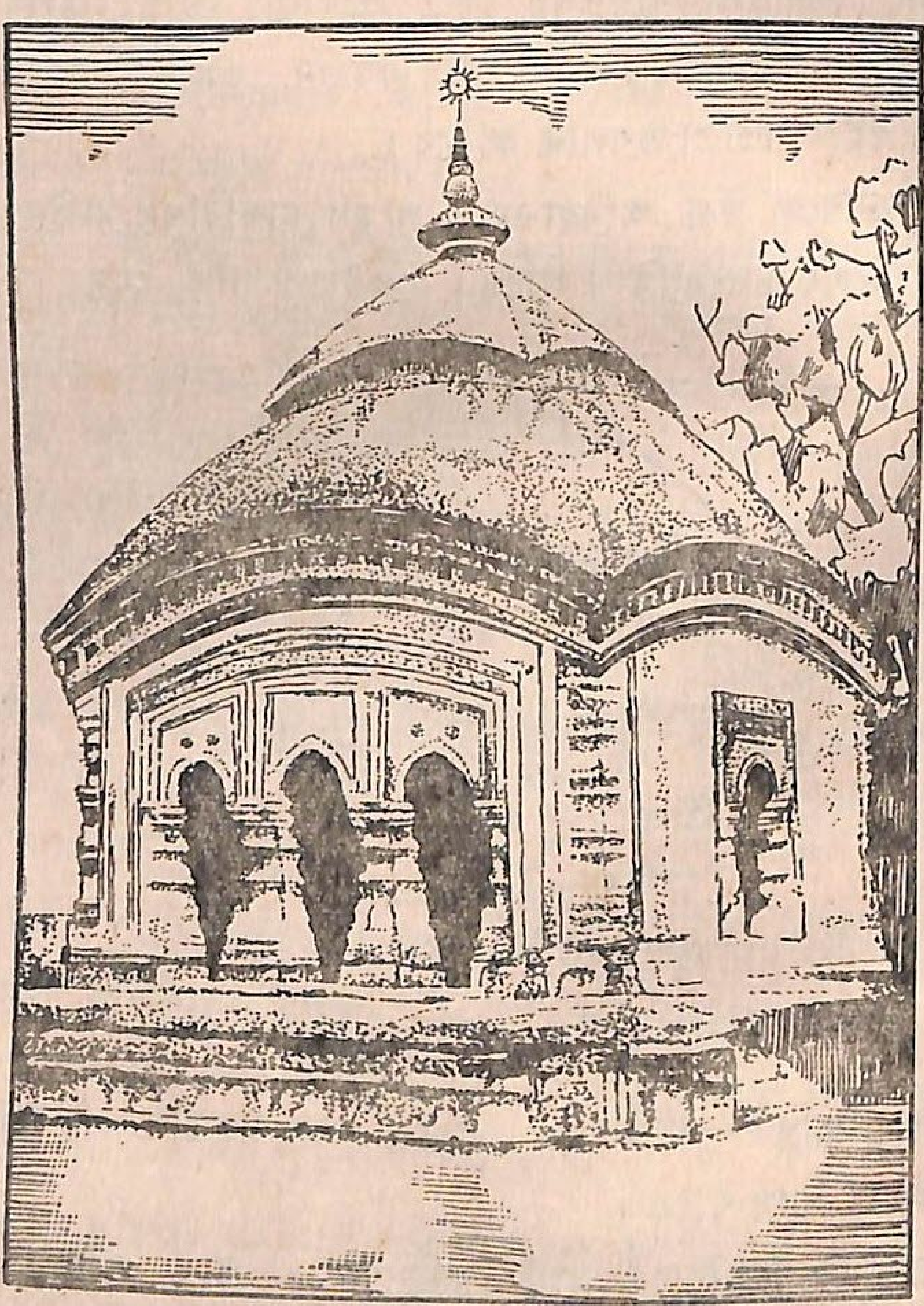
মাটির কোঠাবাড়ি : খড়ের চাল।

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত—গ্রীষ্মকালে গৃহের অভ্যন্তরভাগ শীতল এবং শীতকালে গরম থাকে।

বাঙালী চিরকালই মার্জিতরুচিসম্পন্ন। তাই প্রাচীন কোঠা-বাড়ির কাঠের উপর কারুকার্য বিশেষ লক্ষণীয়। এইজন্যই পশ্চিমবঙ্গে প্রাচীন মন্দিরগাত্রের কারুকার্য ও টেরাকোটা-চিত্র আজও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে।

গ্রামাঞ্চলে যাঁহারা উচ্চ মধ্যবিত্ত, যাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল তাঁহারা কেহ কেহ টিনের একতলা বা দোতলা বাড়ি নির্মাণ

করেন। টিনের ঘর গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় খুব গরম হয় এবং

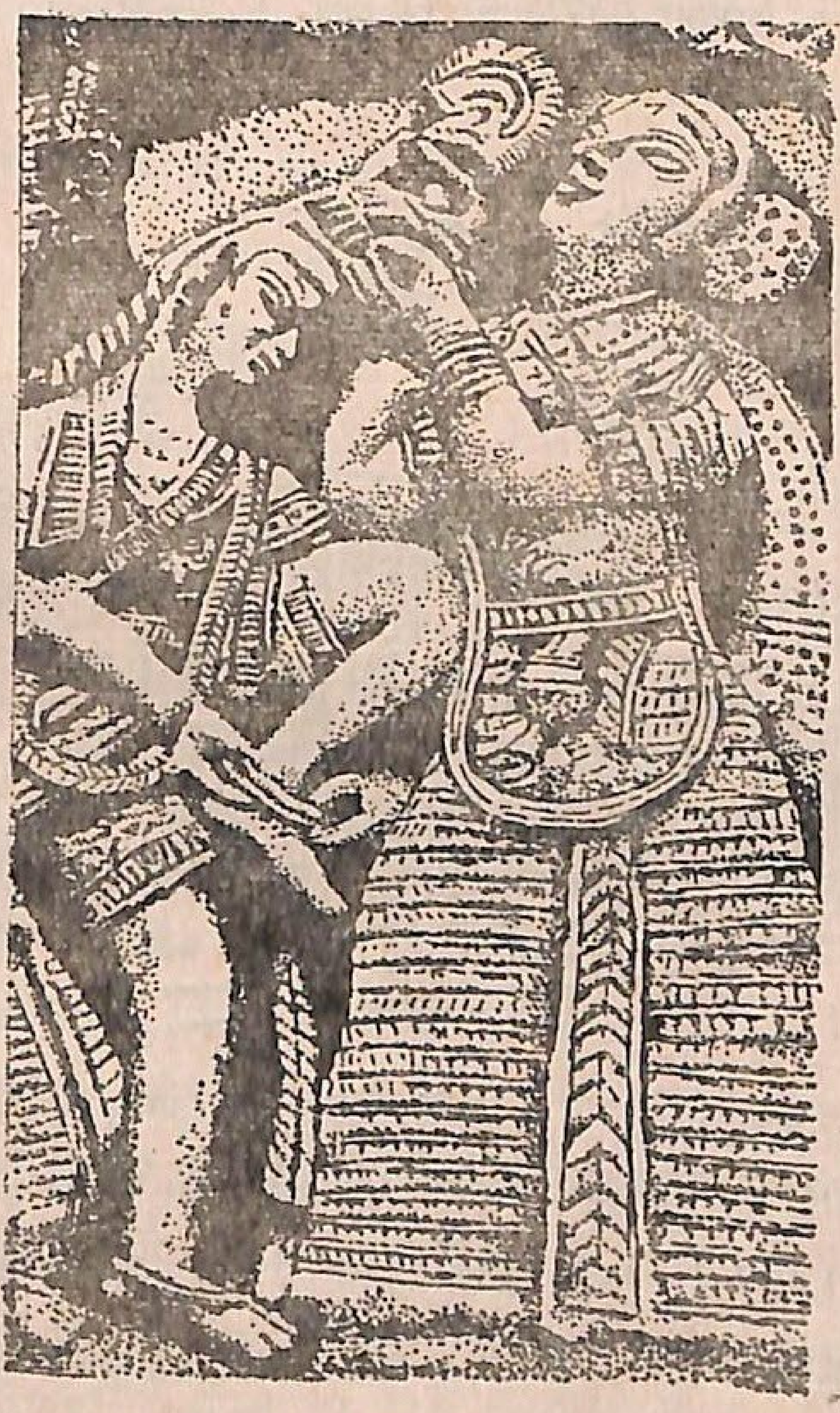


মন্দিরগাত্রের কারুকার্য।

শীতকালে রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা হয়। তবে আগুনের ভয় থাকে না এই যা মন্দের ভাল।

হিমালয়ের পার্বত্যঅঞ্চলে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও শীতে তুষারপাত হয়। অরণ্যে প্রচুর কাষ্ঠ পাওয়া যায়। সেইজন্য

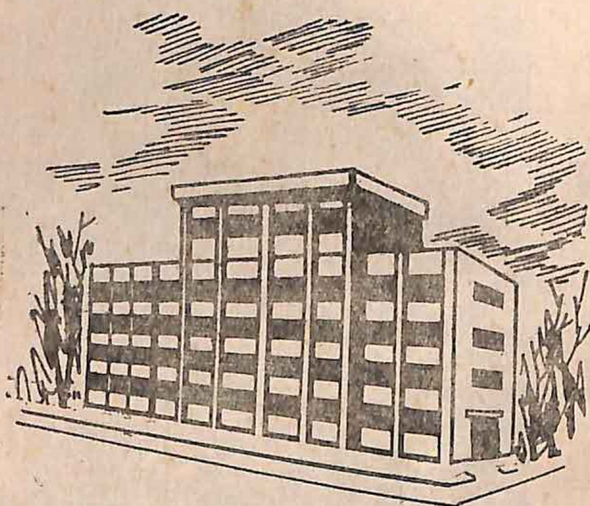
এই অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিকাংশ কাঠের বাড়িতে বাস করেন। কাঠের উঁচু মাচাঘরেও আবার কেহ কেহ বাস করিয়া থাকেন। দার্জিলিং শহরে অবশ্য পাকা বাড়িও আছে।



রাধাদামোদর মন্দিরগাত্রে 'টেরাকোটা'—হৃদয়নারায়ণপুর, বাঁকুড়া।

বর্তমানে মানুষের অবস্থা এবং রুচিরও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। অর্থবান ব্যক্তিমাত্রেই—চাকুরিয়া বা ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি—ক্ষমতা অনুসারে দালানবাড়ি নির্মাণ করেন; ইহাদের সাজ-সজ্জা অধিকাংশই উচ্চ রুচিবোধের পরিচয় দেয়।

কলিকাতার মত শহরাঞ্চলে যেখানে গৃহসমস্যা অত্যন্ত জটিল, সেখানে সরকার নিজ তত্ত্বাবধানে কলিকাতা ও শহরতলীতে গৃহ নির্মাণ করিয়া নিম্ন-আয় ও মধ্য-আয় ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করিয়া থাকেন। কিন্তু গৃহসমস্যা এত বিরাট যে, এই প্রচেষ্টাও পর্যাপ্ত নহে।



গৃহসমস্যার সমাধানে সরকার ও C. M. D. A. কর্তৃক নির্মিত অট্টালিকা।

বস্তি অঞ্চলের অধিবাসীরা অত্যন্ত দুর্গতির মধ্যে বাস করিতেন। সুখের বিষয়, C.M.D.A.* এইদিকে নজর দিয়াছেন এবং বস্তি অঞ্চলে অধিবাসীদের বসবাসের জন্য বিরাট বিরাট উচ্চ অট্টালিকা নির্মিত হইতেছে।

স্বাধীনতা লাভের পর গ্রামাঞ্চলেও বৈদ্যুতিক আলোক পৌঁছিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম গ্রামাঞ্চলে বাড়িঘরের ক্রমিক উন্নতি। সেইজন্য পল্লীঅঞ্চলের ভবিষ্যৎ যে শহরাঞ্চলের মতই উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় তাহা সহজেই অনুমেয়।

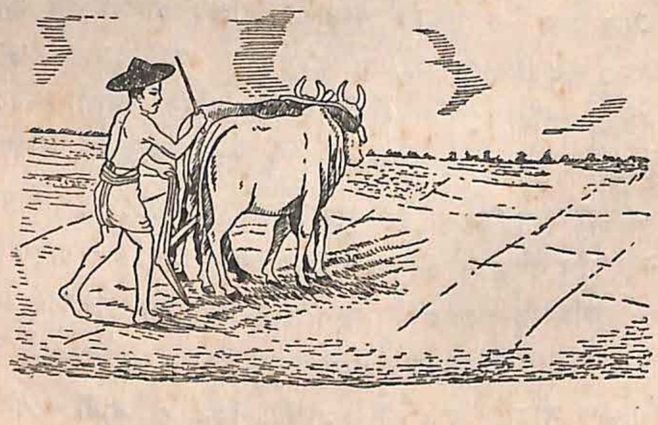
* C. M. D. A.—Calcutta Metropolitan Development Authority.

1.1.4. পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের জীবিকা (Occupation)ঃ বাঙালী অতীতে চিরকালই কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের গৌরব বোধ করিয়াছে, কিন্তু কখনও অর্থকে প্রাধান্য দেয় নাই বা তজ্জন্য গর্ব বোধও করে নাই। যে দেশে আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি 'বুনো রামনাথ', যিনি তেঁতুল পাতা ব্যঞ্জন হিসাবে খাইয়াও কৃষ্ণনগরের মহারাজার অর্থসম্বন্ধীয় 'অনুপপত্তি' প্রশ্নের উত্তরে 'আমার শাস্ত্রসম্পর্কীয় কোন অনুপপত্তি নাই' উত্তর দেন, সে দেশে জ্ঞানার্জন বা শিক্ষা-দীক্ষাই যে প্রধান তাহা অতি বড় সত্য। এই যুগেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনাড়ম্বর বা সহজ জীবনযাত্রা ও উচ্চ চিন্তাধারা (plain living and high thinking) বাঙালী জীবনের প্রকৃত রূপ যেন উদ্ঘাটিত করে। বাঙালী মস্তিষ্ক চালনাকেই জীবিকা উপার্জনের পথ হিসাবে বাছিয়া লইয়াছে। তাই বড় বড় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিষ্টার, জজ, প্রফেসার, বৈজ্ঞানিক বাঙালী পরিবারের রত্নস্বরূপ। সে বরাবরই ব্যবসায় ও শিল্পকে অবহেলা করিয়াছে। আজ তাহার মূল্য উচ্চহারেই তাহাকে দিতে হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান শিল্প ও ধনসম্পদ অবাঙালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের হাতে। ক্বচিৎ দু-এক জন শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী বাঙালী আছেন যাঁহাদের সর্বভারতীয় খ্যাতি আছে।

শিক্ষিত সাধারণ বাঙালী সমাজ—পুরুষ ও নারী—যেন এক কেরাণী জাতিঃ জীবিকার জন্য তাঁহারা কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কিংবা সরকারের কোন বিভাগে কেরাণীর কাজ করিয়া দিনাতিপাত করেন। আচার্য পি. সি. রায়ের ইহার জন্য আক্ষেপের অন্ত ছিল না। তিনি সামান্য মূলধন লইয়া বেঙ্গল ক্যামিকেল এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস লিঃ (Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ltd.) প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া বাঙালী

শিক্ষিত যুবকদের ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। তাঁহার সে চেষ্টা অনেকটা ফলবতী হইয়াছে। বাঙালী আজ শিল্পের পথে, ব্যবসায়ের পথে আত্মপ্রতিষ্ঠায় মন দিয়াছে। জীবিকার প্রতিযোগিতায় সে আজ সর্বক্ষেত্রে জয়ী হইবার জন্য দৃঢ়সংকল্প। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উৎসাহী দক্ষ যুবকদের সরকার কর্তৃক অর্থ সাহায্য এবং ব্যাঙ্ক হইতে ঋণদান নিশ্চয়ই উৎসাহব্যঞ্জক।

পশ্চিমবঙ্গ শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায় লইয়া গঠিত নয়। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের অধিকাংশই (শতকরা প্রায় 75 ভাগ) গ্রামাঞ্চলে

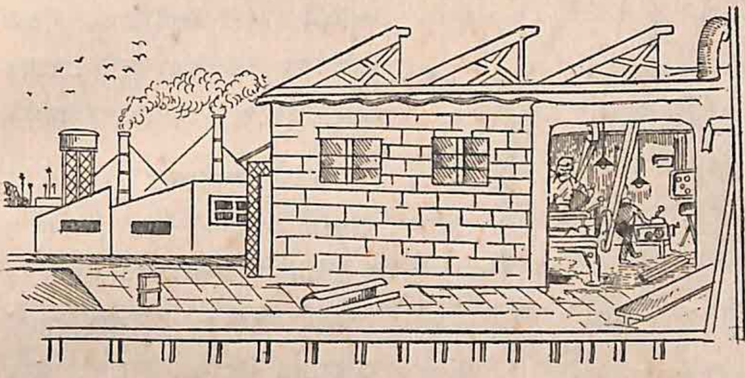


কৃষিকার্যে জীবিকা অর্জন—কৃষক।

বাস করেন। পশ্চিমবঙ্গ কৃষিপ্রধান। কৃষিকার্যই তাঁহাদের (শতকরা 27 ভাগ-এর) প্রধান উপজীবিকা। কৃষিকে অবলম্বন করিয়াই এই দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গঠিত। ইহার সঙ্গে হাঁস, মুরগীর খামার (mixed diary) করিয়া আরও কিছু উপরি উপার্জন

করিবার চেষ্টা তাঁহারা করেন। মোট কথা সবুজ বিপ্লবে কৃষকেরাই প্রধান হাতিয়ার।

বাঙালী সমাজের কামার, কুমার, তাঁতি, গয়লা প্রভৃতি সাধারণতঃ স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা উপার্জন করিয়া থাকেন।



শিল্প ও শ্রমিক।

তারপর শিল্পক্ষেত্রে—পশ্চিমবঙ্গে লৌহ, পাট, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির নানা শিল্প আছে। শ্রমিক সম্প্রদায় 'গরিবী হটাও' অভিযানের প্রধান অস্ত্র। তাঁহাদের মধ্যেও শিক্ষিত কিছু আছে, তবে তাঁহাদেরই কায়িক পরিশ্রমে দেশের শিল্পসমৃদ্ধি আজ উন্নতির পথে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প সম্পর্কে বিশেষ অগ্রসর। পশ্চিমবঙ্গের এই খ্যাতি রক্ষা শ্রমিক সম্প্রদায়েরই হাতে। তাই তাঁহাদের জীবিকার প্রতি শিল্পপতিদের মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। খনির শ্রমিকদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরাও কৃষিকার্য, মালবহন, ভ্রমণকারীদের পরিচর্যা বা অন্যান্য কার্য করিয়া জীবিকা উপার্জন করেন।

বীরভূম, বাঁকুড়া অঞ্চলে মুণ্ডারা, সাঁওতালরাও বর্তমানে কিছু

কিছু কৃষিকার্য করিয়া থাকেন। আর সময় ও সুযোগ পাইলে কখনও কখনও দলবদ্ধভাবে শিকারে বাহির হন।



শিকারে ব্যাপৃত সাঁওতাল পুরুষ।

বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ জেলায় কিছু ব্যক্তি ভেড়া প্রভৃতি পশু-পালন ও পশুচারণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। ভেড়ার পশম হইতে কম্বল প্রস্তুত হয়।

আর সমাজের নিম্নস্তরের যাঁহারা—মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় 'হরিজন সম্প্রদায়'—যাঁহাদের পিছনে 'শুচিতা ফিরিছে সদা' তাঁহাদের কথাও উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সমাজের সেবা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের জন্য সমাজচিত্রও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

1.2. ভূ-প্রকৃতি : পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, মৃত্তিকা, নদ-নদী-সমূহ ও জলবায়ু (Land forms including mountains, plateaus and plains, soil, rivers and climate)

ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ও আকৃতি বা আয়তন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। সেই-জন্য প্রথমে তাহা উল্লেখ করা হইল।

অবস্থান : বঙ্গবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের আয়তন প্রথমে যাহা ছিল তাহা এখন কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে : উত্তর-পূর্বস্থিত কুচবিহার

রাজ্য জেলা হিসাবে এবং চন্দননগর (ফরাসী অধিকৃত) মহকুমা হিসাবে পরে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

1956 সালের 1লা নভেম্বর হইতে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিহারের খনিজ সম্ভারে সমৃদ্ধ মানভূম জেলার পুরুলিয়া অঞ্চল এবং পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ ও তৎসংলগ্ন কিছু ভূমি পশ্চিমবঙ্গের সহিত পুনরায় যুক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন আরও 3157 বর্গ মাইল বা 8208 বর্গ কিলোমিটার (পুরুলিয়া 6234·8 ব. কি.মি. এবং পূর্ণিয়া 1973·4 ব. কি.মি.) বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা বিশেষ লাভ হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের সহিত দক্ষিণাংশের প্রাথমিক (ভারতবিভাগের সময়) যে বিচ্ছিন্নতা ছিল তাহার বিলুপ্তি হইয়া উভয় অংশের সংযোগ সাধিত হইয়াছে।

এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ উত্তরে হিমালয় পর্বত হইতে দক্ষিণে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এক অখণ্ড ভূমি। ইহার চতুঃসীমা বলিতে উত্তরে হিমালয় পর্বত, ভুটান ও সিকিম পার্বত্য রাজ্য; পূর্বে আসাম ও বাংলাদেশ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ছোটনাগপুরের উচ্চ মালভূমি অঞ্চল, বিহার ও নেপাল।

আয়তন: পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আয়তন 33,928 বর্গমাইল বা 88,200 বর্গ কিলোমিটার।

ভূ-প্রকৃতি*: পশ্চিমবঙ্গ সর্বত্র সমতল নহে, বৈচিত্র্যময়। উত্তরে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত উচ্চ পর্বত, সমভূমি, অনুচ্চ মালভূমি এবং সমভূমি যেন পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত।

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গকে নিম্নলিখিত ছয়টি সুস্পষ্ট অঞ্চলে

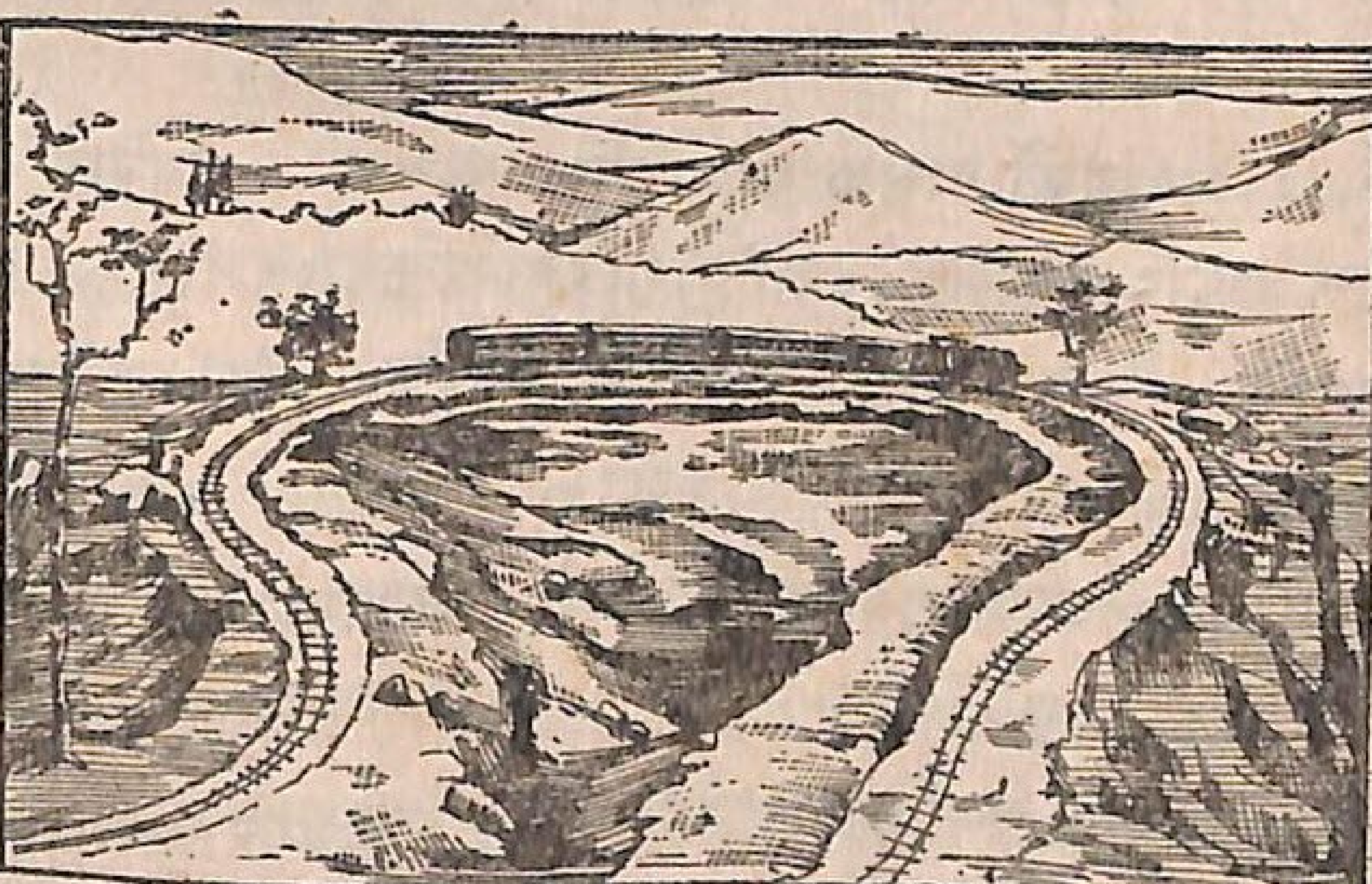
* পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতির বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে পাইবে। সেইজন্য এখানে ইহা সাধারণভাবে উল্লেখ করা হইল।



পশ্চিম বঙ্গ
প্রাকৃতিক বিভাগ
কি. মি.
0 20 40 60 80
উ
গঙ্গা নঃ
পদ্মা নঃ
ময়ূরাক্ষী নঃ
অজয় নঃ
দামোদর নঃ
দ্বারকেশ্বর নঃ
শিলাই নঃ
উ ড়ি ষ্যা
ব ঙ্গো প সা গ র

বিভক্ত করা যাইতে পারে : (1) উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, (2) তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল, (3) গঙ্গা ও তিস্তার দোয়াব অঞ্চল, (4) মধ্যবর্তী অনুচ্চ মালভূমি অঞ্চল, (5) গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল, এবং (6) সমুদ্র উপকূলবর্তী নিম্নভূমি।

1.2.1. উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল : হিমালয়ের বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলের অতি সামান্যই পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত, তবু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দার্জিলিং শহর (7,376 ফুট, 2248 মি.) যেন ইহার কেন্দ্রস্থল—নীচে হইতে ইহাকে চমৎকার পটে আঁকা ছবির মত দেখায়। সমভূমিস্থ শিলিগুড়ি হইতে রেলপথে বা মোটর পথে সেখানে যাওয়া যায়। দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথের বাঁকের (loop-এর) দৃশ্য মনে বিশেষ



দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথ—বাতাসিয়া লুপ—ঘুম।

রেখাপাত করে। দার্জিলিংএর নিকটে টাইগার হিলস্ হইতে সূর্যোদয় দর্শন, কিংবা কাঞ্চনজঙ্ঘার পিরামিড-সদৃশ উচ্চ শীর্ষে (28,146 ফিট, বা 8579 মি.) সূর্যোদয়ের সময় রঙের খেলা

অবিস্মরণীয়। সমগ্র হিমালয়ের—প্রায় 1500 মাইল দীর্ঘ—মধ্যে এই অংশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সত্যই অন্যতম বিশেষ সমৃদ্ধ অঞ্চল।

তিস্তানদী এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া গভীর খাতে নিম্নে প্রবাহিত।

এখানে কয়েকটি স্বাস্থ্যনিবাস আছে; যথা, কালিম্পং, কার্শিয়াং প্রভৃতি।

1.2.2. **তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল :** হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশস্থ তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল দীর্ঘতৃণ ও শাল, শিশু প্রভৃতি বৃক্ষের ঘন অরণ্যে আবৃত। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য এখানের নিম্নভূমি অঞ্চল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

1.2.3. **গঙ্গা ও তিস্তার মধ্যবর্তী দোয়াব* অঞ্চল :** ইহা পলিমাটি গঠিত, অত্যন্ত উর্বরা, কৃষিকার্যের উপযোগী। পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ির সমভূমি, মালদহ প্রভৃতি জেলা এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

1.2.4. **মধ্যবর্তী অনুচ্চ মালভূমি অঞ্চল :** বর্ধমানবিভাগের পশ্চিমাংশ অর্থাৎ পুরুলিয়া, মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ বাঁকুড়া, দুর্গাপুর-আসানসোল, বীরভূম এই অঞ্চলের অন্তর্গত। ইহা ছোটনাগপুরের মালভূমির সম্প্রসারিত অংশ, কঙ্করময়, কোথাও কোথাও অনুচ্চ পাহাড় আছে; তন্মধ্যে পুরুলিয়া জেলায় অযোধ্যা পাহাড়, সীমান্তে পঞ্চকোট (2,200 ফুট, 670·6 মি.) এবং বাঁকুড়ার বিহারীনাথ ও শুশুনিয়া পাহাড় সমধিক উল্লেখযোগ্য। কোথাও বা (বীরভূমে) মৃত্তিকা লাল। ইহা বীরভূম জেলায় নলহাটির সন্নিকটে কতকগুলি উঁচু ঢিবিতে বা টিলায় শেষ হইয়াছে।

এই অঞ্চল সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে খনিজ সম্পদে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ।

---

* দোয়াব 'দ্বীপ' বা দো-আপ হিন্দী শব্দের অপভ্রংশ—সুতরাং দুইদিকে নদী পরিবৃত সমভূমিকে দোয়াব বলে।

এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধস্থানসমূহ ঃ

আসানসোল—রেলওয়ে জংশন ও শিল্পকেন্দ্র।

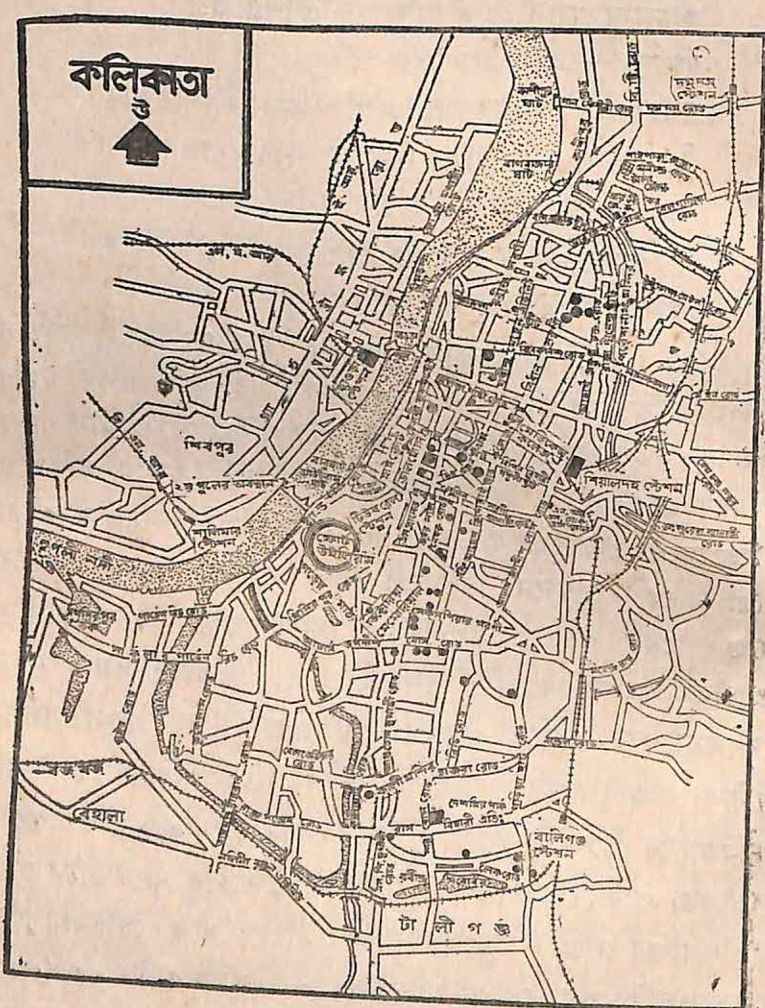
বার্ণপুর—লৌহশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

দুর্গাপুর—ইস্পাতনগরী, লৌহ ও অন্যান্য শিল্পকেন্দ্র।

চিত্তরঞ্জন—রেল ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানার জন্য উল্লেখযোগ্য।

শান্তিনিকেতন—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত বিশ্বভারতী এখানে প্রতিষ্ঠিত।

1.2.5. গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল ঃ ইহা এক বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চল। মালভূমির দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গের অবশিষ্ট অধিকাংশই ইহার অন্তর্গত। ইহা গঙ্গার সুবিশাল ব-দ্বীপেরই পশ্চিমাংশ, প্রাচীন পলল মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত, বিশেষ উর্বরা। গঙ্গা নদী তাহার গতিপথে বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যমুনার সহিত মিলিত হইয়া পদ্মা নামে সেখানে এখনও নূতন মৃত্তিকা অঞ্চল গঠনে ব্যস্ত। সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশের এই সমভূমিকে প্রাচীন পললমৃত্তিকাগঠিত বলা হইয়াছে। কারণ গঙ্গার নূতন দেশগঠন কার্য এখানে একরূপ বন্ধ আছে। এই অঞ্চল পলল-মৃত্তিকা বা চলিত কথায় পলিমাটি দ্বারা গঠিত বলিয়া খুব উর্বরা, কৃষিকার্যের বিশেষ উপযোগী। কোন কোন স্থানে এই মৃত্তিকাস্তরের গভীরতা প্রায় (1200 ফিট, 365·76 মি.); তাহার নীচে কঠিন ভূস্তর বা শিলাস্তর আছে। অনেক ভৌগোলিকের মতে, ছোটনাগপুরের যে মালভূমির কথা বলা হইয়াছে উহা যেন এখানে বাটির মত (cup-shaped) বসিয়া গিয়া আবার পূর্ব-ভারতে আসাম ইত্যাদির পার্বত্য অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই বাটির মত গভীর নিম্নঅঞ্চল গঙ্গা বা পদ্মানদীবাহিত পললমৃত্তিকা দ্বারা ভরাট হইয়া পূর্বের


কলিকাতা
উ
দমদম স্টেশন
শিবপুর
শিয়ালদহ স্টেশন
বেহালা
বালিগঞ্জ স্টেশন
টা লী গ ঞ্জ

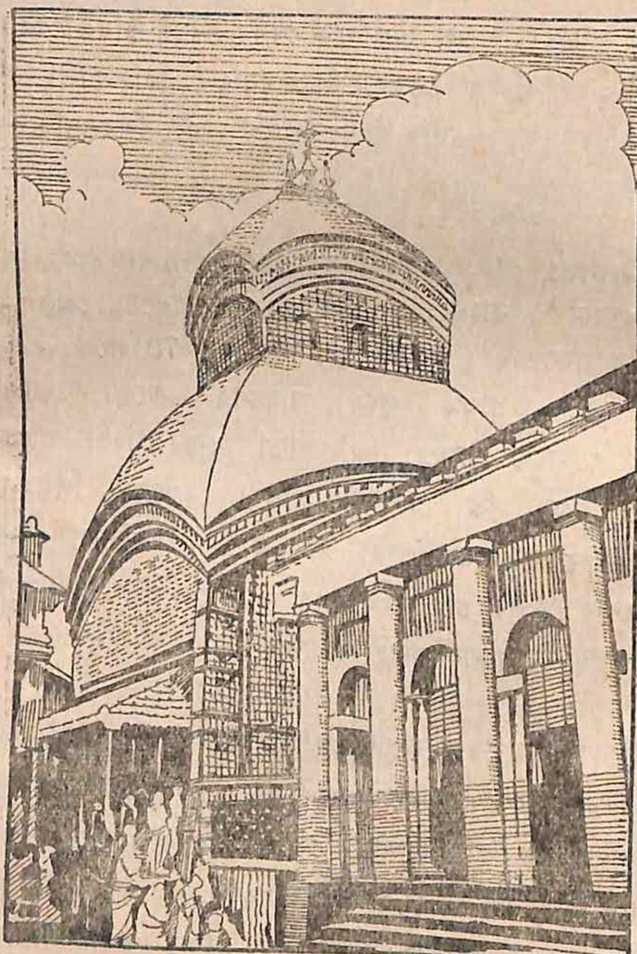
অবিভক্ত বঙ্গদেশ গঠিত করিয়াছে। এইরূপ ভরাটের ফলস্বরূপ সমুদ্র (বঙ্গোপসাগর) দক্ষিণে আরও সরিয়া যাইতেছে।

এই সমভূমি অঞ্চল একদিকে যেমন উর্বরা, কৃষিকার্যের বিশেষ উপযোগী ; অপরদিকে তেমনই শিল্পসমৃদ্ধও। কলিকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করিয়া গঙ্গা নদীর উভয় পার্শ্বে এই শিল্পসমৃদ্ধি গড়িয়া উঠিয়াছে।

কলিকাতা—সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রস্বরূপ, রাজধানী, শিক্ষা ও কৃষ্টির ধারক ও বাহক। কলিকাতা পূর্ব-ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরী, বৃহত্তর কলিকাতার (উপকণ্ঠসহ) জনসংখ্যা 70 লক্ষেরও অধিক, ভারতে ইহা প্রথম স্থান অধিকার করে। কলিকাতা ব্যবসা-বাণিজ্যেরও কেন্দ্র, কলিকাতা বন্দর দিয়া পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, এমন কি নেপাল প্রভৃতি দেশেরও শিল্পদ্রব্য ও খাদ্য প্রভৃতির আমদানী-রপ্তানী হইয়া থাকে। কলিকাতা বন্দরের (নদী বন্দর) উপর চাপ কমাইবার জন্য হলদিয়ায় সমুদ্রোপকূলে বিরাট বন্দর নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়াছে।

কলিকাতাকে কেহ কেহ 'প্রাসাদ নগরী' (City of Palaces) আখ্যা দিয়া থাকেন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সময় বঙ্গবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমনে দেশের ভূমির উপর যে অসম্ভব চাপ পড়িয়াছে কলিকাতা তাহা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। সেই হিসাবে কলিকাতা এক সমস্যাজর্জরিত নগরী। সুখের কথা, কলিকাতাকে সুন্দর ও শ্রীমণ্ডিত করিবার জন্য C.M.D.A. ও কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন এবং এই দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা হইতেছে। কলিকাতাকে যে সুন্দর ও

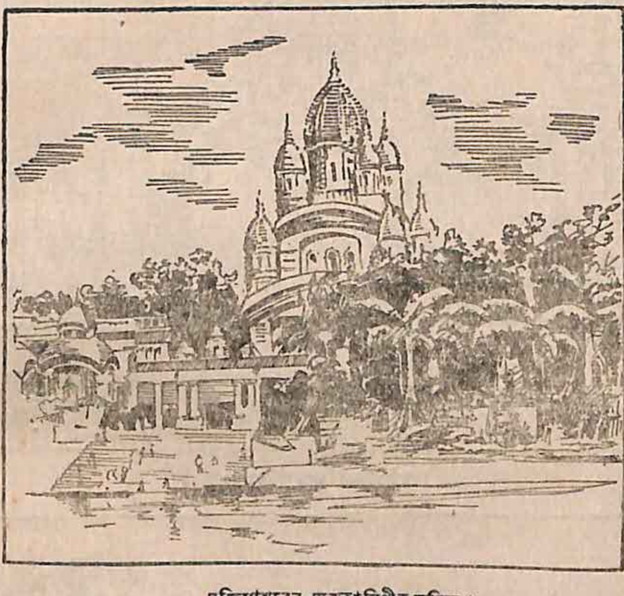
শ্রীমণ্ডিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা কলিকাতার নানা সমস্যার



কালীঘাটের কালীমন্দির।

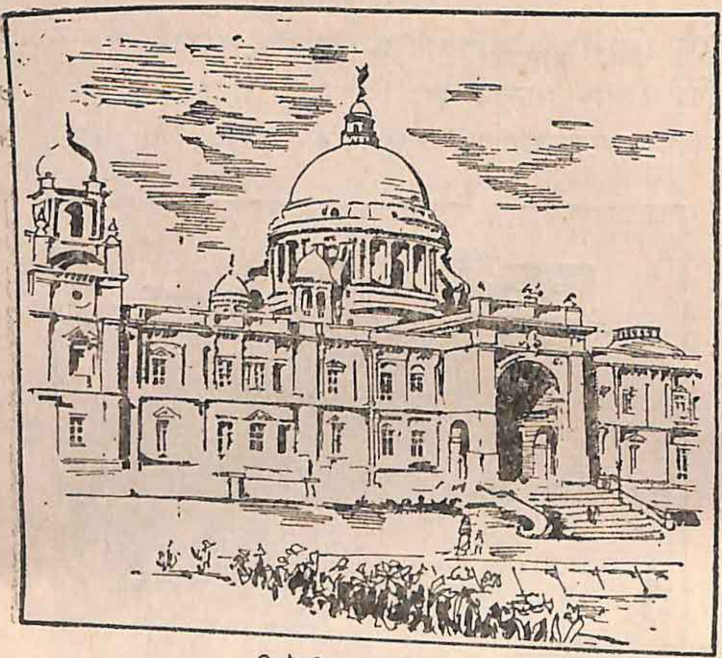
সুষ্ঠু সমাধানের উপর নির্ভর করে। কলিকাতার নাগরিক জীবন যাহাতে সহজ, স্বচ্ছন্দময় ও সাবলীল হইতে পারে তাহাই এই

সম্পর্কে চিন্তনীয়। কলিকাতায় জন-চাপ ও যানবাহন চলাচলের অসুবিধা রাস্তায় অনুভূত হয়, বিশেষতঃ অফিসের সময়ে। তাই কলিকাতার মধ্যে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ভূগর্ভ বা পাতাল রেল

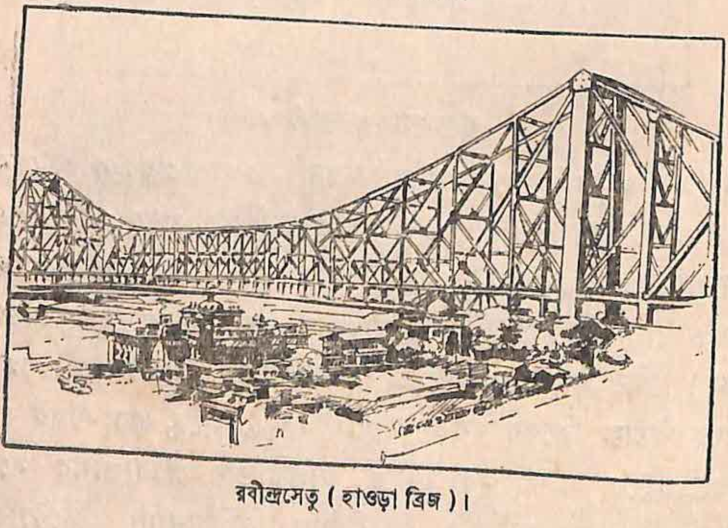


দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দির।

পথ (Tube Railway)-এর পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা প্রাথমিক পর্যায়ে দমদম হইতে টালিগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় 16·43 কিলোমিটার বিস্তৃত হইবে এবং ইতিমধ্যে ইহার কার্য আরম্ভ হইয়াছে। আরও যে, কলিকাতায় আসা-যাওয়ার জন্য রবীন্দ্রসেতুর (হাওড়া ব্রিজ) উপর চাপ হ্রাসের জন্য ফোর্ট উইলিয়মের নিকটে গঙ্গার উপরে দ্বিতীয় ব্রিজের খসড়া অনুমোদিত হইয়াছে, এবং শীঘ্রই কার্য আরম্ভ হইবে আশা করা যায়। কলিকাতায় দ্রষ্টব্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কালীঘাটের কালীমন্দির, পরেশনাথ মন্দির, বেলুড়ে



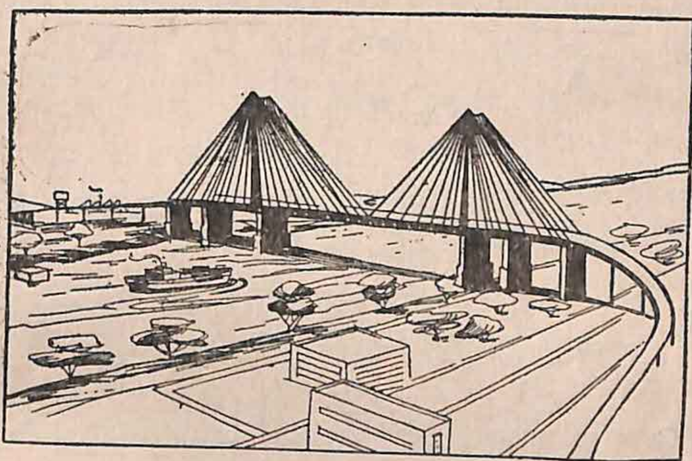
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।



রবীন্দ্রসেতু (হাওড়া ব্রিজ)।

রামকৃষ্ণের মঠ, দক্ষিণেশ্বরে আছাপীঠের মন্দির, ভবতারিণীর মন্দির (রামকৃষ্ণের সাধনপীঠ) প্রভৃতি।

কলিকাতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র ভারতী ও কলিকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত।

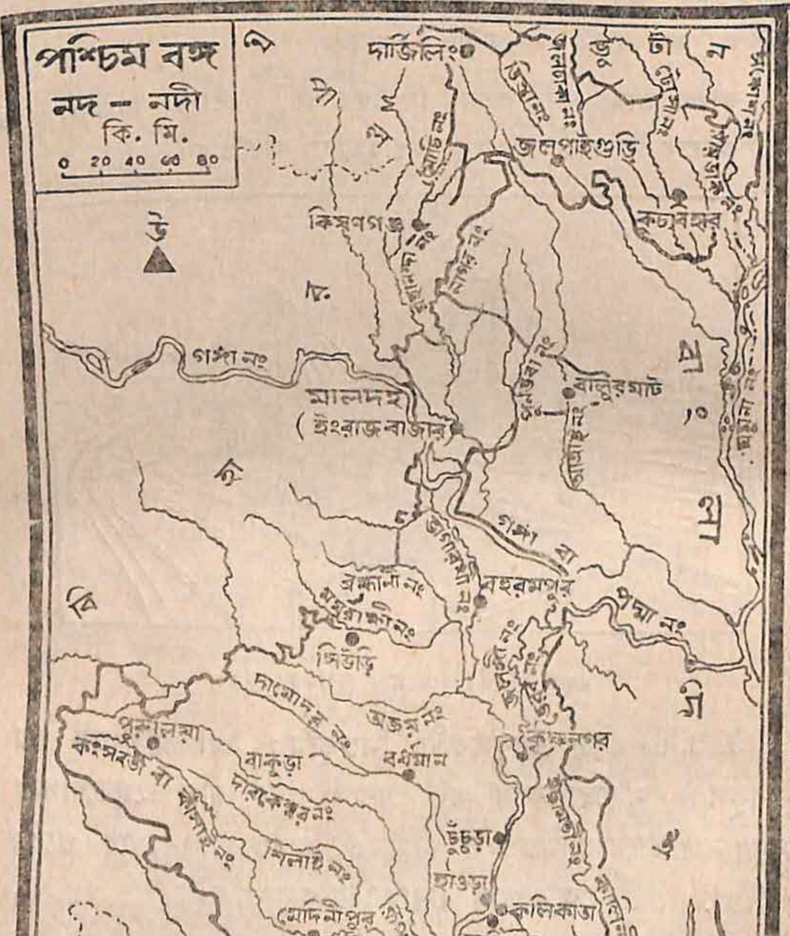


নবপরিকল্পিত দ্বিতীয় সেতু (অরবিন্দ সেতু)।

1. 2. 6. সমুদ্র উপকূলবর্তী নিম্নভূমি: ইহা দ্বীপবহুল ভগ্ন উপকূল। সমুদ্রোপকূলে এই প্রসঙ্গে সাগর দ্বীপ উল্লেখযোগ্য। সমুদ্র নানাস্থানে খাড়ির মধ্য দিয়া এই অঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, কোন কোন্ স্থান আবার নিম্ন জলাভূমি।

ইহা গভীর অরণ্যে আবৃত সুন্দরবন নামে পরিচিত। সুন্দরী নামের এক শ্রেণীর বৃক্ষের আধিক্যের জন্যই এই অরণ্যের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

সুন্দরবন অঞ্চলের রয়েল বেঙ্গল টাইগার বিশেষ প্রসিদ্ধ, ইহাকে জাতীয় পশুর মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।


পশ্চিম বঙ্গ
নদ — নদী
কি. মি.
0 20 40 60 80
উ
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কুচবিহার
কিষণগঞ্জ
গঙ্গা নং
মালদহ
(ইংরাজবাজার)
বালুরঘাট
বহরমপুর
পদ্মা নং
ব্রাহ্মণী নং
ময়ূরাক্ষী নং
সিউড়ি
দামোদর নং
অজয় নং
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
বর্ধমান
দারকেশ্বর নং
কৃষ্ণনগর
চুঁচুড়া
হাওড়া
কলিকাতা
আলিপুর
শিলাই নং
মেদিনীপুর
হলদী নং
উ ড়ি ষ্যা
হুগলী নং
ব ঙ্গো প সা গ র

প্রসঙ্গতঃ মেদিনীপুর জেলায় সমুদ্রোপকূলে খাড়ির পরিবর্তে বালিয়াড়ি (বালির অনুচ্চ সারি) দেখা যায়। ইহা উড়িষ্যার উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত।

দীঘা—সমুদ্রোপকূলে উন্নতিশীল ভ্রমণকেন্দ্র।

1. 2. 7. **মৃত্তিকা :** পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা ভূ-প্রকৃতি অনুসারে স্থানবিশেষে বিভিন্ন। যথা, দার্জিলিং অঞ্চলের মৃত্তিকা উপরে খনিজ মাটির স্তর দ্বারা এবং নিম্নে উর্বর উদ্ভিজ্জ 'হিউমাস' দ্বারা গঠিত।

আবার, দামোদর ও ভাগীরথীর মধ্যবর্তী—মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূমের—মালভূমি অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে 'ল্যাটেরাইট' মৃত্তিকার আচ্ছাদন দেখা যায়। বাঁকুড়া জেলার মাটি প্রায়ই ল্যাটেরাইট। বীরভূম জেলার লাল মাটি ল্যাটেরাইট বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে ছোটনাগপুর পাহাড়েরই বাহিত মৃত্তিকা।

পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়ার কিছু অংশসমেত প্রায় সর্বত্র রাঢ় অঞ্চল পুরাতন পললমৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। ইহা এঁটেল প্রকৃতির, ধূসর বর্ণের ও কঙ্করবহুল। অবশিষ্ট অংশ আধুনিক পললমৃত্তিকা গঠিত অত্যন্ত উর্বর, কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

1. 2. 8. **নদ-নদীসমূহ :** অবিভক্ত বঙ্গদেশকে নদীমাতৃক দেশ বলা হইত, তবে সেই হিসাবে নদীর সংখ্যা বাংলাদেশে বেশী হইলেও পশ্চিমবঙ্গেও নদ-নদীর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নহে। স্বাধীনতা-লাভের পর নদীগুলিতে বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ করিয়া উহাদের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। নদ-নদী দেশের জল-সম্পদ।

নিম্নে পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদী সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া হইল।

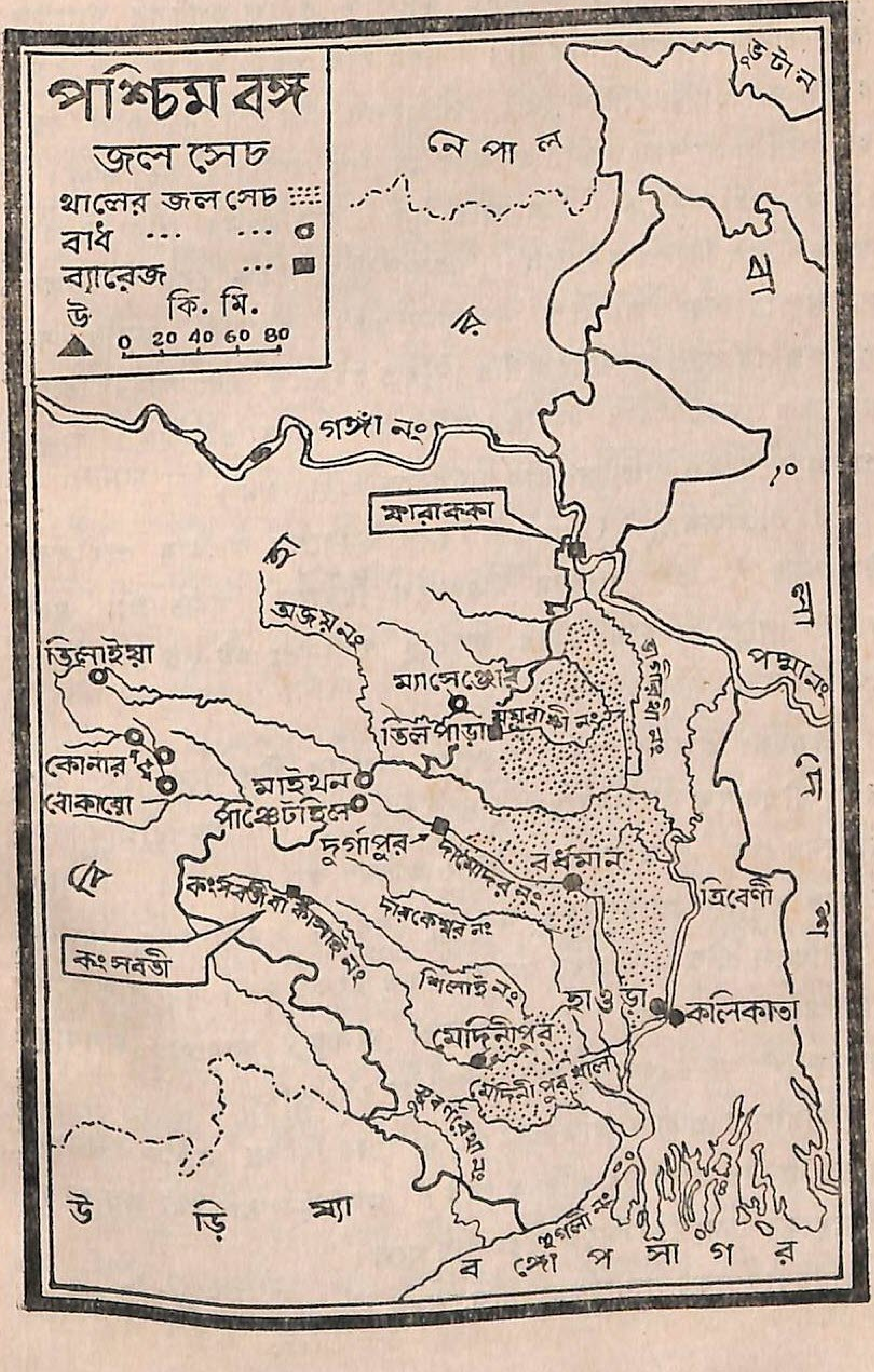
গঙ্গা, ভাগীরথী, হুগলী, পদ্মার কিয়দংশ, দামোদর, অজয়,

ময়ূরাক্ষী, রূপনারায়ণ, আত্রেয়ী, মহানন্দা প্রভৃতি এই রাজ্যের প্রধান নদ-নদী, তন্মধ্যে গঙ্গাই প্রধান।

ভাগীরথী গঙ্গার প্রধান শাখানদী। দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী, কাঁসাই বা কংসাবতী ও রূপনারায়ণ ভাগীরথীর প্রধান প্রধান উপনদী। ইহারা ব্যতীত জলঙ্গী, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, চূর্ণী, ইছামতী, মাতলা, রায়মঙ্গল প্রভৃতি শাখানদীগুলি দক্ষিণ-বঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছে। নবদ্বীপের নিকট জলঙ্গী নদী ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তাহার পর হইতে ভাগীরথী হুগলী নদী নামে প্রবাহিত। হুগলী নদীর অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতে থাকায় ফরাক্কার নিকট গঙ্গার উপর বাঁধ (ব্যারেজ) নির্মিত হইয়াছে। ইহার ফলে, আশা করা যায়, হুগলী নদী বারমাসই জাহাজ চলাচলের পক্ষে নাব্য থাকিবে। ইহাতে কলিকাতা বন্দরের উপযোগিতা অব্যাহত থাকিবে। কলিকাতা বন্দরের বিকল্প হিসাবে হলদিয়ায় বিরাট বন্দর নির্মিত হইতেছে। সেখানেও সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করিতে পারিবে।

গঙ্গার উপনদী মহানন্দা ও ব্রহ্মপুত্রের উপনদী টোর্সা, আত্রাই ও তিস্তা উত্তর-বঙ্গে প্রবাহিত। তিস্তা নদীর বন্যায় মধ্যে মধ্যে জলপাইগুড়ির ভীষণ ক্ষতি হয় বলিয়া পার্শ্বে দীর্ঘ বাঁধ দিয়া প্লাবনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

তিস্তার ন্যায় পূর্বে (বিস্ময়ের বিষয় প্রায় 30 বৎসর পর পর) দামোদর নদের বন্যায় এত বেশী ক্ষয়-ক্ষতি হইত যে, ইহাকে 'বাংলার অভিশাপ' বলা হইত। ইহাতে কয়েকটি বাঁধ (তিলাইয়া, কোনার, পাঞ্চেত, মাইথন-বাঁধ এবং দুর্গাপুর ব্যারেজ) নির্মাণ করিয়া বন্যানিয়ন্ত্রণের এবং সেই সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও ছোটনাগপুর পার্বত্যঅঞ্চলে (দামোদর নদ


পশ্চিম বঙ্গ
জল সেচ
খালের জলসেচ
বাঁধ
ব্যারেজ
উ
কি. মি.
0 20 40 60 80
নেপাল
ভুটান
গঙ্গা নং
ফারাক্কা
অজয় নং
ভিলাইয়া
ম্যাসেঞ্জোর
ময়ূরাক্ষী নং
তিলপাড়া
ভাগীরথী নং
পদ্মা নং
কোনার
মাইথন
পাঞ্চেৎহিল
বোকারো
দুর্গাপুর
দামোদর নং
বর্ধমান
ত্রিবেণী
কংসাবতী বা কাঁসাই নং
দ্বারকেশ্বর নং
কংসবতী
শিলাই নং
হাওড়া
কলিকাতা
মেদিনীপুর
মেদিনীপুর খাল
সুবর্ণরেখা নং
উ ড়ি ষ্যা
হুগলী নং
ব ঙ্গো প সা গ র

সেখান হইতে উৎপন্ন) অত্যধিক বৃষ্টিপাত হইলে দুর্গাপুর ব্যারেজ তাহা ধরিয়া রাখিতে পারে না। তখন বাধ্য হইয়া দুর্গাপুর ব্যারেজ হইতে জল ছাড়িয়া দিতে হয়। তাহাতেও পার্শ্ববর্তী নিম্নাঞ্চলে বন্যা হয়, তবে পূর্বাপেক্ষা বন্যার প্রকোপ যে হ্রাস পাইয়াছে, ইহা সত্য।

ময়ূরাক্ষী নদীতে (মাসাঞ্জোর বাঁধ) কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য অনুরূপ বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। কংসাবতী নদীতেও সেচ পরিকল্পনা সমাপ্তপ্রায় এবং আংশিক সাফল্যমণ্ডিত। বীরভূম জেলায় সেচ পরিকল্পনায় বক্রেশ্বর নদীতে বাঁধ নির্মিত হইয়াছে এবং অধুনা হিংলা নদীতেও একটি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। অজয় প্রকল্প সম্পর্কেও রাজ্য সরকার অর্থবরাদ্দ করিয়াছেন।

1. 3. জলবায়ু (Climate) : পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু প্রধানতঃ উষ্ণ-আর্দ্র। এই রাজ্যের উত্তরাংশে হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে সমুদ্র থাকায় ইহার জলবায়ু প্রধানতঃ এই দুই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

উত্তরের হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের জলবায়ু শীতকালে হিমশীতল এবং গ্রীষ্মকালে আরামদায়ক (60° ফাঃ)। সেইজন্য গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের জন্য গ্রীষ্মকালে দার্জিলিং-এ ভ্রমণ করিতে যান। আবার দক্ষিণে সমুদ্রের সান্নিধ্যহেতু জলবায়ু সেখানে সমভাবাপন্ন, অর্থাৎ দক্ষিণাঞ্চলে গ্রীষ্ম তত প্রখর নয় বা শীতও উৎকট নয়। সমুদ্রোপকূলে দীঘা স্বাস্থ্যকর স্থান। কিন্তু মধ্যবর্তী মালভূমি অঞ্চলের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত খর—এখানে শীতাতপের প্রাবল্য অধিক।

আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে, বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে আমরা বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুর পরিচয় পাই। জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে ঋতুসমূহের ক্রমপরিবর্তনকে ঋতুপর্যায় বলে।

পৃথিবীর সর্বত্র সাধারণতঃ গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত ও বসন্ত চারিটি ঋতুর

সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ছয়টি ঋতু সুস্পষ্ট দেখা যায়। গ্রীষ্মের অব্যবহিত পরে প্রচুর বৃষ্টি হয়। ফলে সেই সময়ে বর্ষা এবং শরৎ-এর পরে হৈমন্তিক ধানের সমারোহ হয় বলিয়া সেই সময়কে পৃথকভাবে হেমন্ত ঋতু নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং, এখানে

গ্রীষ্ম—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস—[*এপ্রিল—জুন]।

বর্ষা—আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস—[জুন—আগষ্ট]।

শরৎ—ভাদ্র ও আশ্বিন মাস—[আগষ্ট—অক্টোবর]।

হেমন্ত—কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস—[অক্টোবর—ডিসেম্বর]।

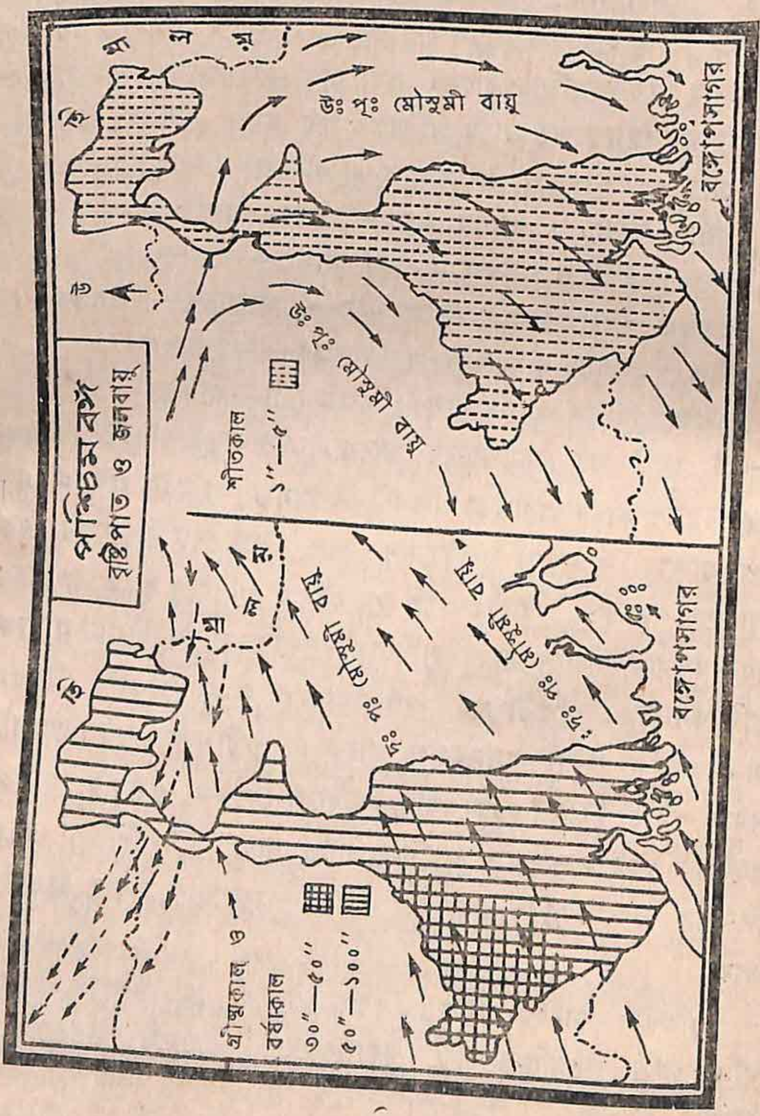
শীত—পৌষ ও মাঘ মাস—[ডিসেম্বর—ফেব্রুয়ারী]।

বসন্ত—ফাল্গুন ও চৈত্র মাস—[ফেব্রুয়ারী—এপ্রিল]।

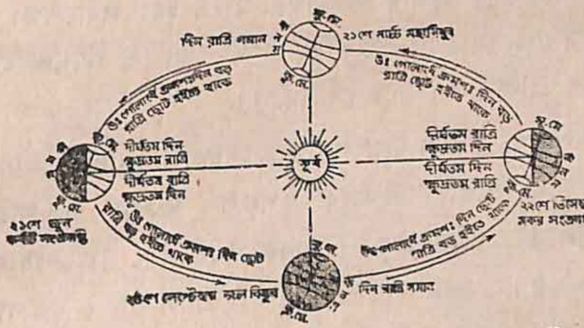
—এই ছয়টি ঋতু ক্রমপর্যায়ে আসে। জলবায়ুর পরিবর্তনের তথা ঋতুপর্যায়ের কারণ প্রধানতঃ তিনটি—**প্রথমতঃ**, পৃথিবী সূর্যকে এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পরিক্রমণ করে, সূর্য সেই উপবৃত্তের এক নাভিতে অবস্থিত। ইহার ফলে সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব বৎসরের সব সময় সমান থাকে না। পৃথিবীর সূর্যপরিক্রমাকে উহার **বার্ষিক** গতি বলা হয়। **দ্বিতীয়তঃ**, সূর্যপরিক্রমার সময় পৃথিবীর মেরুদণ্ড বা মেরুরেখা সর্বদা সমান্তরাল থাকে। **তৃতীয়তঃ**, সূর্যপরিক্রমার সময়ে পৃথিবী নিজের মেরুরেখার চতুর্দিকে দৈনিক একবার আবর্তন করে। ইহাকে পৃথিবীর **আহ্নিক গতি** বলে। উপরি-উক্ত কারণ তিনটির মধ্যে পৃথিবীর বার্ষিক গতিই ঋতুপর্যায়ের জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে সূর্যের যে আপাত উত্তর ও দক্ষিণ গতি পরিলক্ষিত হয়, ইহাদিগকে যথাক্রমে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বলে। গ্রীষ্মকালে সূর্যের উত্তরায়ণের সঙ্গে সূর্যালোক

*ইংরাজী 14-ই এপ্রিল বাংলা বৎসর আরম্ভ হয়।


পশ্চিমবঙ্গ বৃষ্টিপাত ও জলবায়ু
উঃ পূঃ মৌসুমী বায়ু
শীতকাল
বঙ্গোপসাগর
দঃ পঃ মৌসুমী বায়ু
গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকাল
১০''—৫০''
৫০''—১০০''

উত্তর গোলার্ধে ক্রমশঃ লম্বভাবে পড়িতে আরম্ভ করে, অধিকন্তু দিনের



দৈর্ঘ্যও তখন বৃদ্ধি পায়। তাহাতে উত্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং (উত্তর গোলার্ধে) কয়েকদিন 100° (ফাঃ) ডিগ্রীরও অধিক তাপ হয়। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী মালভূমি অঞ্চলে—বার্ণপুর, দুর্গাপুর, বীরভূম, বাঁকুড়ায়—উত্তাপ 115°—116° (ফাঃ) পর্যন্ত উঠে।

ইহার ফলে সমস্ত অঞ্চলের বায়ু প্রসারিত হইয়া ঊর্ধ্বে উত্থিত হয় এবং দেশের উপর এক নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। তজ্জন্য কিছুদিনের মধ্যে দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর হইতে জলীয়বাষ্পপূর্ণ মৌসুমী বায়ু দেশের উপর প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। প্রথমে টুকরা টুকরা পাতলা মেঘ আকাশে বায়ুপ্রবাহে উত্তর দিকে যাইতে দেখা যায়। তারপর যেন সমস্ত আকাশ জুড়িয়াই মেঘের ছাউনি পড়ে। এই মেঘ হিমালয়ের পর্বতগাত্রে বাধা পাইয়া ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে চেষ্টা করে এবং ঊর্ধ্ববায়ুস্তরের শৈত্যপ্রবাহে শীতল হইয়া বৃষ্টিদান করে। সমস্ত দেশ জুড়িয়াই তখন বৃষ্টি হয়, তবে পার্বত্যঅঞ্চলে ও দক্ষিণের সমুদ্রোপকূলে বৃষ্টিপাত সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। ইহাই তখন বর্ষাকাল। এই মৌসুমীবায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাকে **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু** বলা হয়।

সাধারণতঃ জুন মাসের মাঝামাঝি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায়

অক্টোবর মাস পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহে পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টিপাত হয়, তবে জুলাই ও আগষ্ট মাসে ইহা সর্বাপেক্ষা বেশী—স্থানভেদে গড়ে প্রায় 60-80 ইঞ্চি, (150-203 সে. মি.),* হিমালয়ের পাদদেশে 100 ইঞ্চি (254 সে. মি.)।

মধ্যে মধ্যে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ (depression)-এর সৃষ্টি হইলে তাহার প্রভাবে উপকূল অঞ্চলে ও সন্নিকটবর্তী জেলাগুলিতে প্রবলবেগে (ঘণ্টায় 100 কি. মি. পর্যন্ত) বায়ু প্রবাহিত হয়। তখন কয়েকদিন ধরিয়া প্রবল ঝড় ও বৃষ্টিপাত হয়।

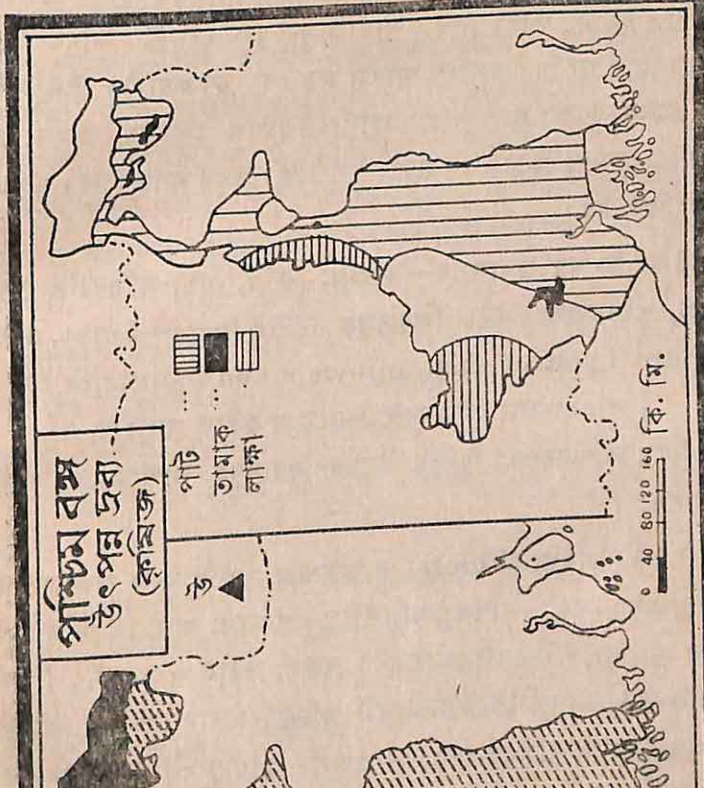
তারপর সূর্যের দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া স্বচ্ছ ও সুন্দর হয়, বাতাসে আগমনীর সুর বাজে। তখন শরৎকাল।

ইহার পর দিন ক্রমশঃ ছোট হইতে থাকে, ঘাসের উপর শিশির বিন্দু সঞ্চিত হয়, বাতাসে শীতের আমেজ অনুভূত হয়—ইহাই হেমন্তকাল।

অক্টোবরের শেষ হইতেই উত্তাপ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। অবশেষে ডিসেম্বরের শেষ ও জানুয়ারীতে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই সময়ের গড় তাপ 60°—65° ফাঃ। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে, এমন কি দার্জিলিং-এর মত শহরে অত্যন্ত শীত পড়ে, কোন কোন দিন তুষারপাত হয় (32° ফাঃ-এর নীচে)। শীতকালে বাতাস উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুপ্রবাহকে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু বলে। ইহার প্রভাবে দেশের সর্বত্রই বেশ শীত পড়ে, তবে মধ্যবর্তী মালভূমি অঞ্চলে গ্রীষ্মের ন্যায়

* বৃষ্টিপাতের পরিমাপ সেণ্টিমিটার (কিংবা ইঞ্চিতে) প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কোন স্থানে বৃষ্টি হইলে যদি তাহা মৃত্তিকা শোষণ করিয়া না লয়, বা তাহার কোন বাষ্পীভবন না হয় বা অন্য কোন প্রকার অপচয় না হয়, তবে 1 বর্গ সেণ্টমিটার স্থানের উপর 1 সেণ্টিমিটার উচ্চ বৃষ্টি দাঁড়াইয়া থাকিবে। বৃষ্টিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে ইহা নির্ণীত হয়।

শীতও অপেক্ষাকৃত তীব্র। উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে বলিয়া উহাতে বৃষ্টিপাত একরূপ হয় না। তবে



দেশের চলিত প্রবাদ 'একা পৌষ মাস পালে বার মাস।' অর্থাৎ,

বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে যে সব জলবায়ু দেখা যায় একা পৌষ মাসেই তাহার ক্রমিক অনুভূতি হয়, সেইজন্য পৌষ মাসে যে একেবারে বৃষ্টিপাত হয় না, তাহা নহে ; সামান্য বৃষ্টি হয় এবং শীত জমিয়া উঠে।

আবার সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হয় এবং ফেব্রুয়ারীর পর হইতে শীত যেমন ক্রমশঃ হ্রাস পায়, সূর্যের উত্তাপও তেমনই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ক্রমশঃ শীতাতপ সমতায় পেঁছে। তখন বসন্তকাল। ঋতুচক্র পরিবর্তিত হয়।

1.4. উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ—অরণ্য, কৃষি, গো-মহিষাদি পশু, মৎস্য, খনিজদ্রব্য এবং শিল্পসমূহ (Products—forest, agriculture, livestock, fish, minerals and industries) :

[পরিসংখ্যান পশ্চিমবঙ্গ তথ্যকেন্দ্র হইতে সংগৃহীত]

নিম্নে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

1.4.1. অরণ্য (Forest) ও অরণ্যজ : পশ্চিমবঙ্গ অরণ্যসম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ নহে—দেশের ভূমিভাগের শতকরা প্রায় 14 ভাগ মাত্র অরণ্য। উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, তরাই ও ডুয়ার্সের বিস্তৃত স্থান (3,131 বর্গ কিলোমিটার) জুড়িয়া গভীর অরণ্য আছে। আবার তেমনই দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চল (4,260 বর্গ কিলোমিটার) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এইগুলি ব্যতীত বাঁকুড়া-বর্ধমান-পুরুলিয়া-মেদিনীপুর-বীরভূম-এর লাল মাটি এলাকায় (4,391 বর্গ কিলোমিটার) এবং পলিপ্রধান মালদহ, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, এলাকায় (45 বর্গ কিলোমিটার)—সর্বসমেত 11,827 বর্গ কিলোমিটার অরণ্য আছে।

উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে শাল, সেগুন, চীর প্রভৃতি চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। কিন্তু সেখানে পথঘাট উন্নত না হওয়ায়

অরণ্যসম্পদ আহরণ সেরূপ অগ্রগতি লাভ করে নাই। দার্জিলিং অঞ্চলের অরণ্যে পাইন, দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। এই সব বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে রেলের স্লীপার, কাগজের মণ্ড, দিয়াশলাই-এর কাঠি, প্যাকিং বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। তরাই অঞ্চলের গভীর জঙ্গলে আবলুস, মেহগনি, শাল, শিমুল, বাঁশ প্রভৃতি জন্মে। সুন্দরবনে সুন্দরী, গরান প্রভৃতি গাছ পাওয়া যায়। সুন্দরী কাষ্ঠ লাল, শক্ত। উহাতে আসবাবপত্র তৈয়ারী হয়। অন্যত্র অরণ্যে শাল, সেগুন, শিশু, অর্জুন, পিয়াল প্রভৃতি বৃক্ষই প্রধান।

তরাই অঞ্চলের গভীর অরণ্যে ও সুন্দরবনে হরিণ, ব্যাঘ্র ও বিভিন্ন পশুপক্ষী বাস করে। ব্যাঘ্রকে সম্প্রতি জাতীয় পশুর (National animal-এর) মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার বনাঞ্চল হইতে লাক্ষা সংগৃহীত হয়।

অরণ্য দেশের বিশেষ সম্পদ—ইহা বৃষ্টিপাতের সহায়তা করে, মৃত্তিকার জলধারণের শক্তি বৃদ্ধি করে, মৃত্তিকার ক্ষয় রোধ করে। সভ্যতা যেমন দেশের আশীর্বাদস্বরূপ, তেমনই তাহার অভিশাপও আছে। সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে কৃত্রিমতা প্রবেশ করে প্রকৃতির নিভৃত রাজ্যে, অরণ্য প্রদেশে—সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে অরণ্য সঙ্কুচিত হয়, কৃষি ও শিল্প তাহার স্থান অধিকার করে। পশ্চিমবঙ্গের এই প্রাকৃতিক সম্পদও সভ্যতার হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। তবে ইহা প্রধানতঃ দক্ষিণাঞ্চলের অরণ্যেই—সুন্দরবনের মধ্যেই—সীমাবদ্ধ। অরণ্যের ক্ষতি করিয়া মানুষ নিজের যে অনিষ্ট করিয়াছে তাহা পূরণের জন্যই সরকার কর্তৃক বনসংরক্ষণ ও প্রতি বৎসর বনমহোৎসব উদ্‌যাপন প্রবর্তিত হইয়াছে।

1. 4. 2. কৃষি (Agriculture) ও কৃষিজ: পশ্চিমবঙ্গ

কৃষিপ্রধান—পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা অনেকস্থলেই বেশ উর্বরা। ইহার উপর উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ, জলসেচের সুব্যবস্থা এবং উচ্চফলনশীল বীজের সাহায্যে কৃষিব্যবস্থায় সত্যই যেন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসিয়াছে। ইহাই 'সবুজ বিপ্লব' নামে খ্যাত। পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য সম্পর্কে স্বয়ংনির্ভর নহে, তবে সবুজ বিপ্লবের ফলে, আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

ধান্য ও পাট এই রাজ্যের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। এই রাজ্যের অধিক উষ্ণতা, প্রচুর বৃষ্টিপাত ও উর্বর মৃত্তিকা ধান্য ও পাট চাষের বিশেষ উপযোগী।

ধান্য ঃ ধান্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে (তামিলনাড়ু প্রথম)। পশ্চিমবঙ্গে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ 1·37 কোটি একর এবং 1971-72 সালে মোট 65,99,500 টোন ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল।

পাট ঃ ভারতে উৎপাদিত পাটের অর্ধেকেরও বেশী পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয়। 1970-71 সালে 2,45,00 হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয় এবং মোট উৎপাদিত পাটের পরিমাণ ছিল 26,62,000 গাঁইট। পাট অর্থকরী ফসল, ইহা হইতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

গম ঃ খাদ্যের অভাব মিটাইবার জন্য দেশে গমের চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। 1971-72 সালে দেশে উৎপন্ন গমের পরিমাণ ছিল 9,28,000 টোন।

ভুট্টা ঃ বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলায় কিছু কিছু ভুট্টা উৎপন্ন হয়। ইহা সাধারণতঃ দরিদ্র লোকদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

ইক্ষু ঃ ইক্ষুর চাষ অল্পবিস্তর পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলাতেই হয়। তবে উৎপন্ন পরিমাণ সেরূপ বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য নহে, গুড় হিসাবেই উহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়।

আলু : পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই আলুর চাষ হয়, তবে গঙ্গার উর্বর দোঁয়াশ পললমৃত্তিকা অঞ্চলে ইহা ভাল উৎপন্ন হয়। হিমঘরের প্রবর্তনের পর হইতে আলু সংরক্ষণের সুব্যবস্থায় দেশে বার মাসই আলুর সরবরাহ অব্যাহত থাকে।

চা : চা উৎপাদনের জন্য ধান্য ও পাটচাষের মত উর্বর মৃত্তিকা, উষ্ণ আবহাওয়া ও প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রয়োজন, তবে উহাদের সহিত পার্থক্য এই যে, গাছের গোড়ায় যাহাতে জল দাঁড়াইয়া না থাকে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সেইজন্য দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স পর্বতগাত্রে চা-এর আবাদ হয়। দার্জিলিং-এর চা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ভারতে উৎপাদিত চা-এর এক-চতুর্থাংশ পশ্চিমবঙ্গেই উৎপন্ন হয়। চা ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ—ইহার শাখা-প্রশাখার কচি দুইটি পাতা ও একটি কুঁড়ি চা-পাতা হিসাবে সংগৃহীত হয়। 1971-72 সালের আবাদযোগ্য চা-বাগিচার পরিমাণ 87,568 হেক্টর এবং উৎপন্ন চা-এর পরিমাণ 1,000 লক্ষ কিলোগ্রাম। চা রপ্তানি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়, তবে এই সম্পর্কে পাটের স্থানই সর্বপ্রথম।

তামাক : জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলায় প্রধানতঃ কিছু তামাক উৎপন্ন হয়।

এইগুলি ব্যতীত দেশে নানাপ্রকার ডাল ও সরিষা, তিল, তিসি প্রভৃতি তৈলবীজ উৎপন্ন হয়, কিন্তু উহাদের কোনটিই দেশের চাহিদার পক্ষে যথেষ্ট নহে। সম্প্রতি তৈলের চাহিদা মিটাইবার জন্য হুগলী ও সুন্দরবন অঞ্চলে সূর্যমুখী ফুলের ব্যাপক চাষে সরকার উৎসাহ দিতেছেন। সূর্যমুখী ফুলের বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়।

তুলা : সম্প্রতি হুগলী, চব্বিশ পরগনা ও সুন্দরবন অঞ্চলে

তূলার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল। সুন্দরবন অঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সরকার কর্তৃক এক বিশেষ পরিকল্পনা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

সিঙ্কোনা : দার্জিলিং-এর মংপুতে সিঙ্কোনার চাষ হয়। সিঙ্কোনা হইতে ম্যালেরিয়া রোগের ঔষধ কুইনাইন প্রস্তুত হয়।

রেশম : মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় তুঁত গাছের পাতায় রেশম কীট প্রতিপালিত হয়। রেশম কীট 'গুটি' নির্মাণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে বাস করে। রেশম গুটি হইতে রেশম তন্তু পাওয়া যায়। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় তসর উৎপন্ন হয়।

পরিশেষে, এই সকল দ্রব্য ব্যতীত দেশে প্রচুর তরি-তরকারী ও নানাপ্রকার ফল উৎপন্ন হয়। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা, আনারস ও দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্রোপকূলে প্রচুর নারিকেল পাওয়া যায়। সমুদ্রোপকূলের নোনা মৃত্তিকায় প্রচুর নারিকেল গাছ জন্মে।

1.4.3. গো-মহিষাদি গৃহপালিত জন্তুসমূহ (Livestock) : আদিম মানব বন্য প্রকৃতির ছিল, শিকার করিয়াই জীবিকা অর্জন করিত। তারপর প্রয়োজনের তাগিদে সে গো-মহিষাদি বন্য জন্তুদের বশ করিয়া পালন করিতে সমর্থ হইল। ইহা মানুষের বিশেষ কৃতিত্ব এবং সভ্যতার পথে তাহার এক প্রধান স্মারকচিহ্ন।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য গো-মহিষাদি, ছাগ, মেষ প্রতিপালিত হয়। ভারত গো-সম্পদে (সংখ্যায়) পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে, কিন্তু দুগ্ধ উৎপাদনে অনেক নীচে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এই সম্পর্কে আরও শোচনীয়। দেশে যথেষ্ট

সংখ্যক (প্রায় 3·5 কোটি) গরু আছে, কিন্তু গোচারণভূমির অভাব, উষ্ণ আবহাওয়া, নিকৃষ্ট শ্রেণীর তৃণজাতীয় খাদ্য (fodder) ও অযত্নের দরুণ দুগ্ধ উৎপাদন অত্যন্ত হতাশাজনক। দুগ্ধের খাদ্যমান অনেক উচ্চে, প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের অভাব ইহা পূরণ করে। সেইজন্য দেশে দুগ্ধের অভাব চিন্তার বিষয়। তাই দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সঙ্কর জাতীয় গরু পালনের দিকে অনেকে মনোযোগী হইয়াছেন ; অবশ্য সেই সঙ্গে কৃষক সমাজে গো-পালন সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয়।

গরুর উপকারিতা বলিয়া শেষ করা যায় না। গরু ভারবাহী জন্তু, কৃষিকার্যে সহায়তা করে, লাঙল ও গাড়ী টানে ; গরুর গোবর, হাড় উৎকৃষ্ট সার ; গরুর চামড়ায় জুতা, সুটকেশ ও নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। গো-মাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সমস্ত দিক বিচার করিয়া বলিতে পারা যায়, গো-পালন এক লাভজনক ব্যবসা।

এদেশের উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ুর বিচারে মহিষই বিশেষ উপযোগী। মহিষের দুগ্ধ বেশ ঘন এবং তাহা হইতে প্রচুর মাখন ও ঘৃত উৎপন্ন হয়। মহিষও গরুর ন্যায় মানুষের নানাবিধ উপকারে লাগে।

কৃষিসম্পদ হিসাবে এবং অপুষ্টিজনিত রোগের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে গো-সম্পদের সংরক্ষণ, চিকিৎসার সুব্যবস্থা অবশ্য কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, দেশে 65টি পশু-চিকিৎসার কেন্দ্র আছে এবং অনেক উপকেন্দ্রও আছে। গ্রামাঞ্চলেও ইহার প্রসার প্রয়োজন।

ছাগ, মেষ প্রভৃতি প্রধানতঃ মাংসের জন্য প্রতিপালিত হয়। ছাগ দুগ্ধও শিশুদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কারণ ইহাতে স্নেহজাতীয় (fat) পদার্থ কম থাকে বলিয়া শিশুদের পক্ষে উহা

সহজপাচ্য। ছাগের উপকারিতা সম্পর্কে দেশে প্রবাদ, 'আছে ঋণ, ত ছাগল কিন।' ছাগলের বংশবৃদ্ধি দ্রুত হয় বলিয়া একথা বলা হয়। ছাগল ও মেষের চামড়া হইতেও আমাদের প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশের মেষের পশম অন্যান্য শীতপ্রধান দেশের বা অস্ট্রেলিয়ার মেষের পশমের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কর্কশ ও মোটা, মেষগুলি আকারেও বেশ ছোট। এখানে মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়া জেলায় প্রচুর মেষ পালিত হয়। ইহাদের লোম মোটা বলিয়া তাহা হইতে কম্বল প্রস্তুত হয়।

এই প্রসঙ্গে ডিম ও মাংসের জন্য হাঁস, মুরগী পালনের কথা উল্লেখযোগ্য। এই দেশের মোরগ-মুরগী সাধারণতঃ অন্যান্য দেশের মোরগ-মুরগীর তুলনায় আকারে ছোট হয়। তাই বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মোরগ-মুরগী (যথা, লেগহর্ণ শ্রেণীর) আনয়ন করিয়া বর্তমানে দেশের বিভিন্ন খামারে প্রতিপালিত হইতেছে। সরকারও এই সম্বন্ধে উৎসাহ দিতেছেন। হাঁস-মুরগীর পালন বিশেষ লাভজনক। তবে ইহা অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য গৃহপালিত জন্তুর সহিত একই খামারে পালিত হয়। এইরূপ ব্যবস্থাকে মিশ্র খামার (mixed farming) বলা হয়। সরকারী তত্ত্বাবধানে এইরূপ কিছুসংখ্যক মিশ্র খামার আছে; সেখান হইতে বিভিন্ন বাজারে ডিম ও মাংস সরবরাহ করা হয়।

খাদ্য হিসাবে শূকর অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের মত বিজ্ঞানসম্মত-প্রথায় এদেশে পালিত হয় না।

সর্বপ্রকার গৃহপালিত জন্তুর খামারে পালনের জন্য বিজ্ঞান-সম্মত উন্নত প্রথার প্রবর্তন দেশের কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে একান্ত প্রয়োজন।

ইহা ব্যতীত অশ্ব ও গর্দভ বাহক ও ভারবাহী জন্তু হিসাবে

পালিত হয়। কুকুর একটি বিশিষ্ট গৃহপালিত জন্তু। ইহার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা নানাবিধ।

পরিশেষে, তোমাদের চতুর্দিকে আর যে সব গৃহপালিত পশু বা পাখী যেমন, পায়রা, ইত্যাদি লক্ষ্য করিবে, তাহাদের সম্বন্ধে নোট রাখিবার চেষ্টা করিবে; তাহা হইলে এই পাঠ ফলপ্রদ হইবে।

1.4.4. মৎস্য বা মাছ (Fish): পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের খাদ্য সম্পর্কে আলোচনার সময় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বাঙালীর খাদ্য-তালিকায় মৎস্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। কিন্তু আমাদের দেশে চাহিদার তুলনায় মাছের বেশ অভাব। বারাকপুরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে মৎস্যচাষ গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। মজা পুকুর প্রভৃতি সংস্কার করিয়া মৎস্যচাষ বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। পুকুরে রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মৎস্যের চাষ হয়। এই সকল ব্যতীত কই, তেলাপিয়া (আমেরিকান কই), মাগুর, সিঙি প্রভৃতি জীয়ল মাছ এবং পুঁটি, মৌরালা প্রভৃতি নানাশ্রেণীর ছোট ছোট মাছ পাওয়া যায়। বহুমুখী নদী-পরিকল্পনায় নদী-বাঁধসমূহে মৎস্যের চাষ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গঙ্গা নদীতে এবং যে সকল নদীতে বার-মাসই জল থাকে, বিশেষতঃ ভাগীরথী, হুগলী প্রভৃতি নদীর সহিত কোন সংযোগ থাকিলে তাহাতে রুই, কাতলা প্রভৃতি বড় বড় মৎস্য পাওয়া যায়। ডায়মণ্ডহারবার, বজবজ প্রভৃতি স্থানের নদী মোহানায়, খাল-বিল অঞ্চলে ও জলা জায়গায় গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি পাওয়া যায়। দেশে-বিদেশে ইহার বিশেষ চাহিদা আছে। বর্ষাকালে গঙ্গানদীতে, বিশেষতঃ মোহানা অঞ্চলে প্রচুর ইলিশ মাছ ধরা পড়ে। উপকূলবর্তী সমুদ্রে ইলিশ বাস করে এবং বর্ষাকালে ডিম পাড়িবার সময় নদীর উজান বাহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলে দলে দলে ধরা পড়ে। ইলিশ একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মৎস্য।

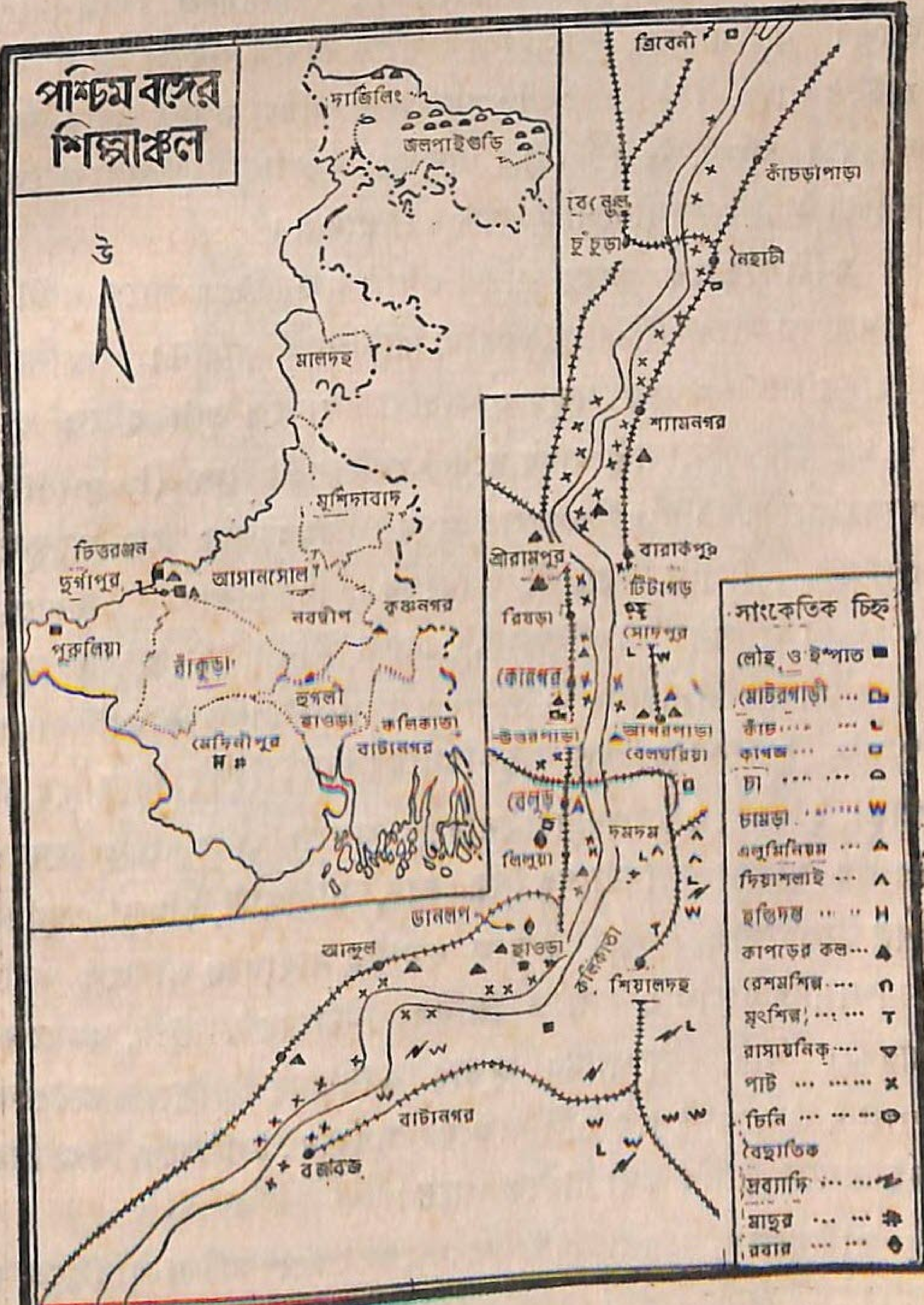
পশ্চিমবঙ্গের মাছের অভাব মিটাইবার জন্য বাংলাদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্য হইতে যেমন মৎস্য আমদানীর ব্যবস্থা হইতেছে, তেমনই অপরদিকে গভীর সমুদ্রে ট্রলারের সাহায্যে মৎস্য ধরিবার পরিকল্পনাও সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের উপকূলবর্তী সমুদ্রে প্রচুর মৎস্য পাইবার সম্ভাবনা আছে।

1.4.5. খনিজদ্রব্যসমূহ (Minerals) : পশ্চিমবঙ্গ খনিজ সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ নহে।

পৃথিবীর খনিজ অঞ্চলসমূহের অবস্থান অনুধাবন করিলে লক্ষ্য করা যায়, দেশে পার্বত্য অঞ্চলের প্রকৃতি খনিজ সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করে। যেখানে ভঙ্গিল পর্বত বা নূতন পর্বত (যেমন হিমালয় পর্বতশ্রেণী) আছে, তাহার পাদদেশে পেট্রোল, কেরোসিন জাতীয় খনিজ তৈল পাওয়া যায় ; কিন্তু যেখানে পর্বত পুরাতন শিলা-গঠিত সেই সব অঞ্চলে কঠিন ধাতব বা অন্যান্য খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ স্থানই পলল মৃত্তিকাগঠিত সমভূমি ; তাই একমাত্র ছোটনাগপুরের সম্প্রসারিত মালভূমি অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র বিশেষ কিছু খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় না এবং এই কারণেই রাণীগঞ্জ অঞ্চলের 500 বর্গ মাইল (1,300 ব. কি.মি.) স্থানের কয়লা খনিগুলি—ভারতে উৎপন্ন কয়লার শতকরা 15 ভাগ—সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহা ব্যতীত বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলায় সামান্য পরিমাণে লৌহ আকর, ফায়ার-ক্লে, চীনামাটি, ডলোমাইট, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে হিমালয় পর্বত অবস্থিত। সেই হিসাবে উহার পাদদেশে খনিজ তৈল আছে বলিয়া অনুমান করা হয়। আসামের তৈলখনিগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ, পশ্চিমবঙ্গেও ভূগর্ভে সেইরূপ তৈল

প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য গঙ্গার নিম্ন ব-দ্বীপ অঞ্চলে—বারুইপুর এবং আরও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সর্বত্র—খনিজ



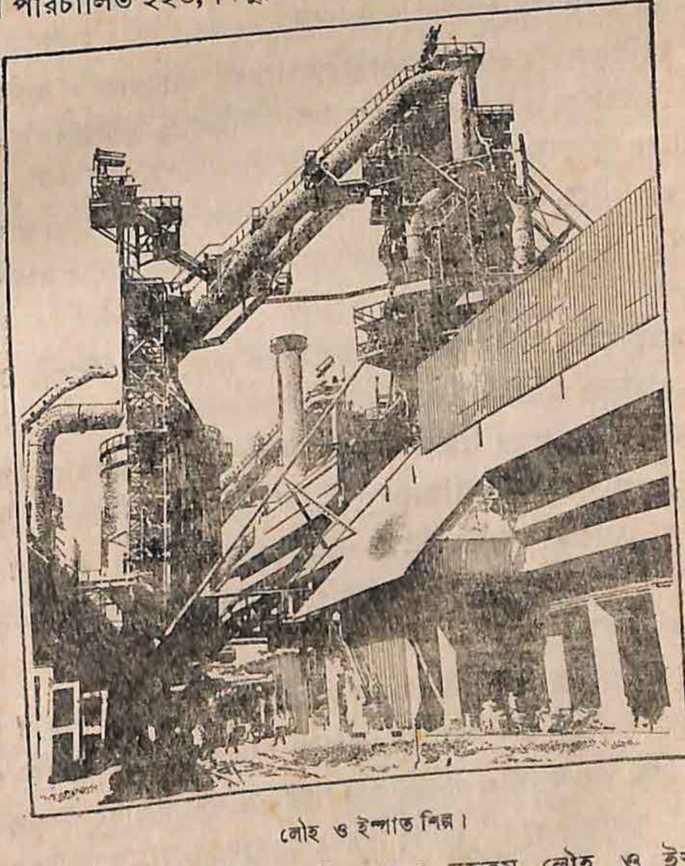
তৈলের ব্যাপক অনুসন্ধান হইয়াছে এবং আশা করা যায়, ভবিষ্যতে আরও হইবে।

1.4.6. **শিল্পসমূহ (Industries)ঃ** পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে বিশেষ উন্নত। এই রাজ্যের শিল্পসমৃদ্ধিকে দুইটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যাইতে পারে—(1) কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া হুগলী নদীর উভয়-তীরবর্তী অঞ্চল, এবং (2) রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া বার্ণপুর-আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল।

কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া হুগলী নদীর উভয় পার্শ্বে পাটশিল্প ও বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তন্মধ্যে পাটশিল্পই প্রধান। বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য অর্থ, সস্তা মজুর ও কাঁচামাল ব্যতীত তূলা হইতে সূতা বা বস্ত্রবয়নের উপযোগী বায়ুর মধ্যে যথেষ্ট জলীয়বাষ্প (humidity) থাকা প্রয়োজন। এই অঞ্চলের বায়ুমণ্ডল বস্ত্রবয়নের পক্ষে অনুকূল। সেইজন্য এখানে বস্ত্রশিল্প বিশেষ বিস্তারলাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বেঙ্গল কেমিক্যাল, বেঙ্গল ইমিউনিটি প্রভৃতি নানা ঔষধ, সাবান, রাসায়নিক ও প্রসাধন শিল্প, টিটাগড় ও কাঁকিনাড়ায় কাগজ, শালিমারে রঙ, কোন্নগরের নিকট হিন্দমোটরে মোটর গাড়ী, হাওড়া ও বেলঘরিয়া-সোদপুর অঞ্চলে লৌহনির্মিত দ্রব্য ও রেলের মালগাড়ী নির্মাণের শিল্প, কাচ, চীনামাটি, চামড়া প্রভৃতির শিল্প উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে হুগলীর সাহাগঞ্জে ডানলপ রবার কোম্পানির টায়ার ও অন্যান্য জিনিস নির্মাণের ফ্যাক্টরি, বজবজের সন্নিকটে বাটা কোম্পানির জুতার কারখানা, ইছাপুরের রাইফেল ফ্যাক্টরি এবং কাশীপুরে গুলি-বারুদের কারখানা, টালিগঞ্জে ফিল্ম শিল্প এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রাণীগঞ্জের কয়লা খনি অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া বার্ণপুরে ও দুর্গাপুরে বিরাট বিরাট লৌহ ও ইস্পাতশিল্প সরকারের তত্ত্বাবধানে

গড়িয়া উঠিয়াছে। বার্ণপুরের কারখানা পূর্বে বেসরকারী কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত হইত, কিছুদিন হইল সরকার তাহারও ভার গ্রহণ



লৌহ ও ইস্পাত শিল্প।

করিয়াছেন। দুর্গাপুরে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত; সেইজন্য দুর্গাপুরকে 'ইস্পাত নগরী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দুর্গাপুরে সরকার পরিচালিত দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিঃ, দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের ইস্পাত কারখানা, মাইনিং অ্যাণ্ড অ্যালায়েড মেশিনারী করপোরেশন, চশমার কাচ

উৎপাদনের কারখানা, ফুড করপোরেশনের সার কারখানা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া বেসরকারী বহু বড় বড় শিল্প-কারখানাও সেখানে আছে।

রাণীগঞ্জের নিকট অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা আছে। **চিত্তরঞ্জনে** রেলের কয়লা-চালিত ইঞ্জিন ও ডিজেল ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা প্রসিদ্ধ।

কল্যাণীতে রাজ্যসরকারের সূতাকল এবং বহু ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা-সমন্বিত শিল্প আছে। তাহা ছাড়া সেখানে বেসরকারী কয়েকটি বড় শিল্প-কারখানাও চালু আছে।

হলদিয়ায় নির্মীয়মান নূতন সামুদ্রিক ডক, তৈল শোধনাগার, সার কারখানা প্রস্তুত হইতেছে।

ফরাক্কা পরিবহন কেন্দ্র হিসাবে—উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সেতুপথ হিসাবে—গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে।

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়িতে কৃষি, চা-বাগিচা, বন ও পার্বত্য অঞ্চলের সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে প্রয়োজন-ভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প।

পুরুলিয়ায় **সাঁওতালডিহি-বামকেনালীতে** ভূতাত্ত্বিক সম্পদ ও নির্মীয়মান তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসহ ভারী ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতব শিল্প এবং কয়লা ও খনিভিত্তিক শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিশিষ্ট শিল্পের উৎপাদন ('70-'71) উল্লেখ করা হইল। (পশ্চিমবঙ্গ তথ্যকেন্দ্র হইতে সংগৃহীত)

পাটজাত দ্রব্য	10·87	লক্ষ টোন
কার্পাস সূতা	39·8	লক্ষ কে.জি.
সূতী বস্ত্র	1·511	লক্ষ মিটার
লোহা (পিগ আয়রণ)	17·6	লক্ষ টোন

ইস্পাত (স্টীল ইনগটস্)	14·3	লক্ষ টোন
ইস্পাত (সুসম্পূর্ণ)	10·1	লক্ষ টোন
চিনি	11·1	হাজার টোন

দেশের শ্রীবৃদ্ধি শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সেইহেতু দেশের বেকার সমস্যার সমাধান এবং দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য আরও অধিক উৎপাদন—কৃষি এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই—এবং শিল্পের আরও প্রসার একান্ত আবশ্যক।

পশ্চিমবঙ্গের কুটীর-শিল্পও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মুর্শিদাবাদে রেশমশিল্প, বীরভূমে তাঁতিপাড়ায় এবং বাঁকুড়ায় বিষ্ণুপুরে তসরশিল্প, শান্তিপুরের তাঁতের কাপড়, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প, বর্ধমানের কাঞ্চননগরে ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি, খাগড়ায় বাসন, শান্তিনিকেতনের কারু-কার্যময় চর্মশিল্প প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের বিশেষ খ্যাতি আছে। বিদেশে ইহার এবং শান্তিনিকেতনের জিনিসের আদর বা চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রশ্নাবলী

(A)

1. (i) পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগকে সাধারণতঃ কি নামে অভিহিত করা হয়?

(ii) "পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সংস্কৃতি 'মহামানবের মিলনে' সে এক মিশ্র সংস্কৃতি যার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জল।"—যুক্তি সাহায্যে এই উক্তি সমর্থন কর বা এই সম্পর্কে তোমার মতামত প্রকাশ কর।

2. (i) বাঙালীর প্রধান খাদ্য সম্পর্কে ভারতীয় অন্যান্য জাতির খাদ্যের সহিত কোন পার্থক্য নাই, সেই সম্বন্ধে তোমার মতামত জ্ঞাপন কর।

(ii) খাদ্য-তালিকায় দুধ ও মাছের উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

(iii) যাঁহারা মাছ-মাংস খান না, তাঁহাদের প্রত্যহ কিছু ডাইল খাওয়া উচিত বলার তাৎপর্য কি ?

3. (i) বাঙালীর সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদের স্বরূপ বর্ণনা কর। এইরূপ পোশাকের উপযোগিতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাও।

(ii) 'পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে আমরা যেন সাম্যনীতিতে বিশ্বাসী।' আলোচনা কর।

4. পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের বাসস্থান সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কিত কর।

5. (i) পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন দিক নির্দেশ কর।

(ii) জীবিকা অর্জন সম্পর্কে অতীতের সহিত বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ও কর্মপ্রচেষ্টার সুযোগ-সুবিধা এবং তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা কর।

6. (i) পশ্চিমবঙ্গের একটি মানচিত্র অঙ্কন করিয়া তাহাতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চল নির্দেশপূর্বক সেই সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(ii) পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিতে কলিকাতা নগরী ও কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব আলোচনা কর।

7. (i) 'পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ নদী।'—ইহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

(ii) দামোদর নদকে পূর্বে 'বাংলার অভিশাপ' বলা হইত। এই পরিপ্রেক্ষিতে দামোদর নদ সম্পর্কে বর্তমান অবস্থার উন্নতি বা অবনতি আলোচনা কর।

(iii) পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জলসেচ পরিকল্পনা সম্পর্কে তোমার যাহা জানা আছে লিখ।

8. পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু সম্পর্কে তোমার যাহা জানা আছে লিখ।

9. পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য সম্পদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

10. (i) 'সবুজ বিপ্লব' কাহাকে বলে? ইহার তাৎপর্য আলোচনা কর।

(ii) পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ সম্পর্কে কিছু বিবরণ দাও।

11. পশ্চিমবঙ্গের গৃহপালিত জন্তুসমূহ সম্পর্কে তোমার নিজের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করিয়া একটি আলোচনা কর।

12. মৎস্যের উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্যচাষের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। আমাদের দেশে কি কি উপায়ে মৎস্যের চাহিদা মেটান সম্ভবপর তাহা উল্লেখ কর।

13. (i) পর্বতের প্রকৃতি বিভিন্ন খনিজ সম্পদের অস্তিত্ব সম্পর্কে কি নির্দেশ দেয় তাহা উল্লেখ কর।

(ii) পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদের একটি বিবরণ দাও।

14. পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও শিল্পসম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা কর।

(B)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী : Objective Tests

1. Recall Type : নির্দেশ : নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অপূর্ণ অংশ উপযুক্ত শব্দ দ্বারা পূরণ কর। পার্শ্বে রেখাচিহ্নিত স্থানে শব্দটি বসাইতে হইবে :

(i) পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগকে —— বলে। ——

(ii) ঋতুপর্যায়ের জন্য প্রধানতঃ দায়ী পৃথিবীর —— গতি। ——

2. Completion Type :

নির্দেশ : নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পাঠ করিয়া অনুক্তিসমূহ উপযুক্ত শব্দ দ্বারা পূরণ কর। পার্শ্বে রেখাচিহ্নিত নির্দিষ্ট স্থানে শব্দগুলি সন্নিবেশ কর :

(1) পশ্চিমবঙ্গের অনুচ্চ মালভূমি অঞ্চল —— (1) মালভূমির সম্প্রসারিত অংশ ; —(2), কোথাও বা অনুচ্চ —— (3) আছে, কোথাও বা মৃত্তিকা —— (4)। ইহা বীরভূম জেলার নলহাটির

—— (1)
—— (2)
—— (3)
—— (4)

সন্নিকটে কতকগুলি উঁচু —— (5) শেষ হইয়াছে। ——(5)

(2) পার্বত্য অঞ্চলের —— (1) দেশের ——(1)

খনিজ সম্পদের —— (2) নির্ধারণ করে। ভঙ্গিল ——(2)

পর্বতের —— (3) সাধারণতঃ —— (4) পাওয়া ——(3)

যায়, আর পুরাতন শিলাগঠিত পার্বত্য অঞ্চলে ——(4)

কঠিন —— (5) পদার্থসমূহ দেখা যায়। ——(5)

3. Alternate Response Type :

(a) True or False Type :

নির্দেশ ঃ নিম্নপ্রদত্ত বাক্যগুলি পাঠ করিয়া যে সব উক্তি সত্য বলিয়া বিবেচনা করিবে তাহাদের জন্য পার্শ্বে রেখাঙ্কিত স্থানে T এবং অন্যান্য উক্তির জন্য অনুরূপ স্থানে F অক্ষর বসাও।

(i) পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে হিমালয় পর্বত অবস্থিত। ——

(ii) বাঙালীরা কর্মবিমুখ জাতি। ——

(iii) সুন্দরী বৃক্ষের নামানুসারে সুন্দরবনের নামকরণ হইয়াছে। ——

(iv) পাট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করে। ——

(b) Yes or No Type :

নির্দেশ ঃ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে যেটির উত্তর হাঁ হইবে তাহার জন্য পার্শ্বে নির্দিষ্ট স্থানে ✓ চিহ্ন, এবং যেটির উত্তর না হইবে তাহার জন্য পার্শ্বে রেখাচিহ্নিত স্থানে × চিহ্ন নির্দেশ কর :

(i) পশ্চিমবঙ্গ কি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ? ——

(ii) বাঙালীদের ঢিলা পোশাক কি স্বাস্থ্যের উপযোগী? ——

(iii) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল হইতে কি প্রচুর কাষ্ঠ আহরণ করা হয়? ——

(iv) হলদিয়া বন্দরের জন্য কি কলিকাতা বন্দরের ক্ষতি হইতে পারে? ——

4. Multiple Choice Type :

নির্দেশ ঃ নিম্নপ্রদত্ত উক্তিগুলির সমর্থনে কয়েকটি করিয়া কারণ দেওয়া

করা আছে। কারণগুলি আপাতদৃষ্টিতে সত্য হইলেও উহাদের উপযোগিতা সম্পর্কে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করিবে। যে কারণটি উত্তর হিসাবে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করিবে তাহার নির্দেশক নম্বর (a, b, c, প্রভৃতি) পার্শ্বের রেখাঙ্কিত স্থানে সন্নিবেশ করঃ ——

(1) কলিকাতা এক সমস্যাজর্জরিত নগরী ; কারণ,

(a) এখানে খাদ্য পরিস্থিতি জটিল,

(b) রুজি-রোজগারের উপায় সীমিত,

(c) যানবাহন ব্যবস্থা অপ্রতুল,

(d) উপরোক্ত সমস্ত কারণই দায়ী,

(e) উপরোক্ত কোনটিই সত্য নহে।

(2) খড়ের চালের মাটির কোঠাবাড়ি প্রাকৃতিক শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। —— কারণ,

(a) খড়ের চাল উত্তাপ প্রবেশের পক্ষে অত্যন্ত পুরু,

(b) মাটির দেওয়াল অত্যন্ত পুরু হয়, উত্তাপ প্রবেশ করিতে পারে না,

(c) খড় ও মাটি উভয়ই উত্তাপের পক্ষে কুপরিবাহক,

(d) উপরোক্ত কোন কারণই সত্য নহে।

2. ত্রিপুরা

ত্রিপুরা পূর্বে একটি দেশীয় রাজ্য ছিল। ইহার মহারাজারা বিদ্যোৎসাহী ও দানবীর বলিয়া বিখ্যাত। ত্রিপুরা ও ত্রিপুরার বাহিরে জনহিতকর কার্যে তাঁহারা প্রচুর দান করিয়াছেন। 1947 খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে ত্রিপুরার শেষ মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের* ইচ্ছানুসারে ত্রিপুরা ভারতে যোগদান করে। 1949 খ্রীষ্টাব্দের 15 অক্টোবর ত্রিপুরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ঐ দিন হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে আসে। 1972 খ্রীষ্টাব্দের 21শে জানুয়ারী ত্রিপুরা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। আসাম-মণিপুর-নাগাভূমির রাজ্যপাল ত্রিপুরারও রাজ্যপাল।

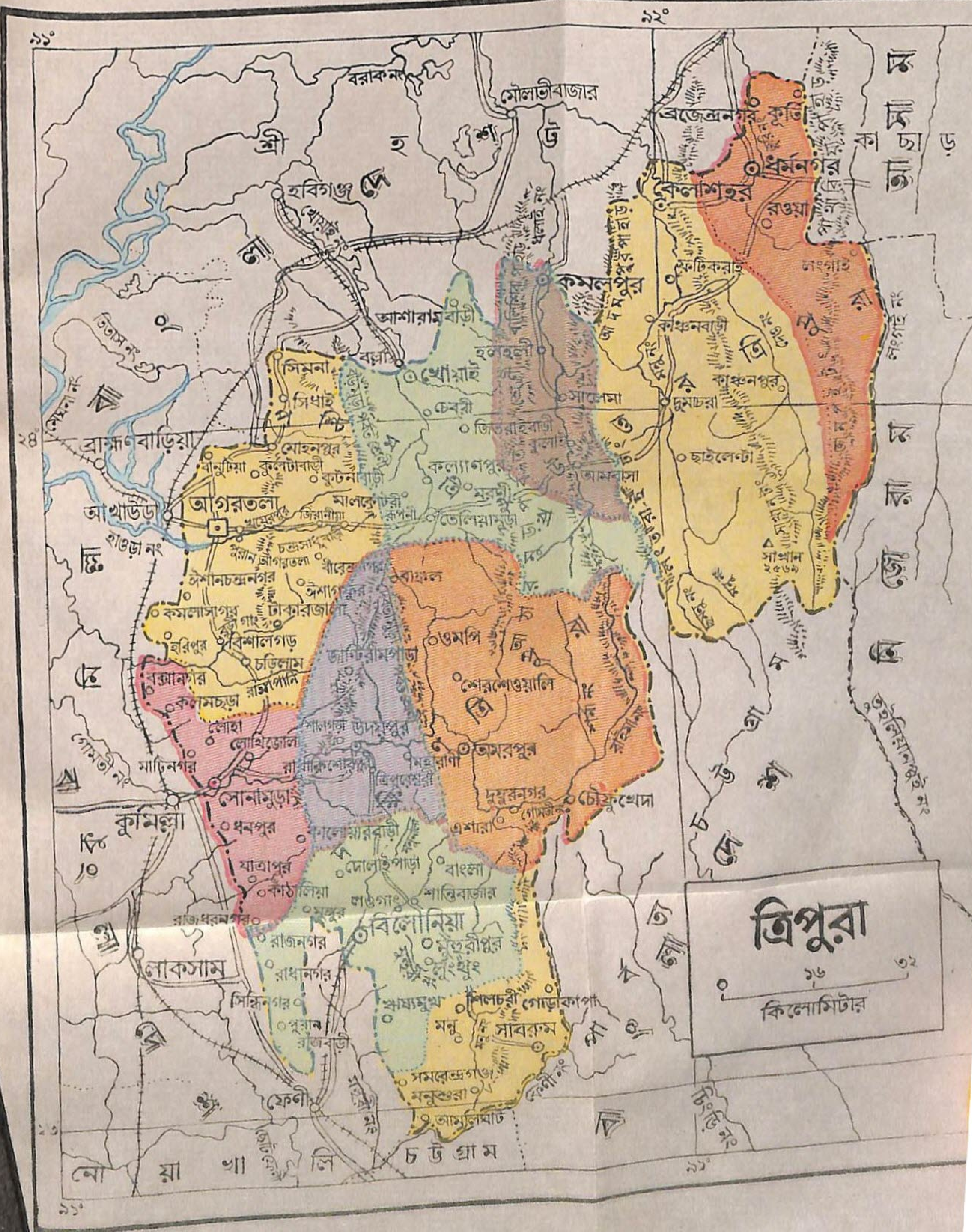
চতুঃসীমা, আয়তন : এই রাজ্যের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ—তিনদিকেই বাংলাদেশ ; উত্তর-পূর্বে আসাম এবং পূর্বে মিজোরাম ও বাংলাদেশ।

ত্রিপুরার মোট আয়তন 4,036 বর্গমাইল বা 10,600 বর্গকিলোমিটার।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য রাজ্যটিকে উত্তর ত্রিপুরা, পশ্চিম ত্রিপুরা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা এই তিনটি জেলা ও দশটি মহকুমায় বিভক্ত করা হইয়াছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মহকুমাগুলি যথাক্রমে ধর্মনগর, কৈলাসহর ও কমলপুর ; পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মহকুমাগুলি যথাক্রমে খোয়াই, সদর (আগরতলা) ও সোনামুড়া, এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মহকুমাগুলি যথাক্রমে উদয়পুর, অমরপুর, বিলোনিয়া ও সাব্রুম।

---

* 1947 খ্রীষ্টাব্দেই তাঁহার অকালমৃত্যু হয়।



ত্রিপুরা
০
১৬
৩২
কিলোমিটার
মৌলভীবাজার
হবিগঞ্জ
ধর্মনগর
কৈলাশহর
কমলপুর
আশারামবাড়ী
খোয়াই
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
আখাউড়া
আগরতলা
কৈলাশহর
কাঞ্চনপুর
ছাইলেংটা
কমলাসাগর
বিশালগড়
সোনামুড়া
কুমিল্লা
অমরপুর
উদয়পুর
বিলোনিয়া
সাব্রুম
লোকসাম
ফেনী
চট্টগ্রাম
নোয়াখালি

অধিবাসী ঃ ত্রিপুরী, রিয়াং, চাকমা, মগ, লুসাই, হালাম প্রভৃতি ত্রিপুরার আদি অধিবাসী (প্রায় 3 লক্ষ)। পূর্বে মোট অধিবাসী সংখ্যা মাত্র কয়েক লক্ষ (10-12) ছিল। তারপর রাজনৈতিক কারণে পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) হইতে অনেক উদ্বাস্তু এবং জীবিকার সন্ধানেও ভারতের বিভিন্ন স্থানের অনেক অধিবাসী এখানে আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছেন। বর্তমানে ত্রিপুরার লোকসংখ্যা প্রায় 15·57 লক্ষ।

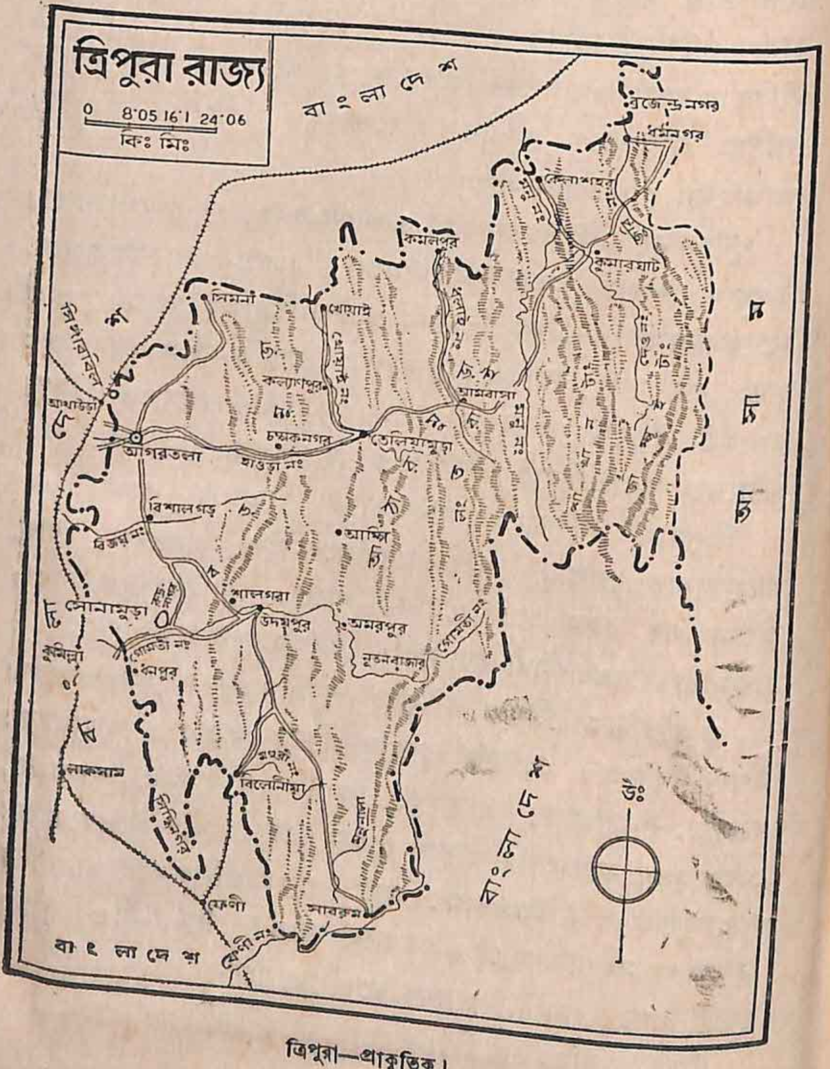
পূর্বতন মহারাজাদের অনুগ্রহে ও ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রিপুরায় শিক্ষার প্রসার উল্লেখযোগ্য। এখানে সাতটি কলেজ, অনেক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয় আছে। তাহা ছাড়া কারিগরি বিদ্যা ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষাদানের জন্য কয়েকটি বৃত্তিমূলক কলেজও আছে। ত্রিপুরার বর্তমানে (1971 খ্রীষ্টাব্দের গণনার হিসাব) শিক্ষিতের হার শতকরা 30·87 জন।

ত্রিপুরার অধিকাংশ অধিবাসীরই মাতৃভাষা বাংলা এবং রাজ্যভাষাও বাংলা। অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সব রকম ধর্মের লোকই আছে। আদিবাসীদের মধ্যে চাকমারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং লুসাইরা অধিকাংশই খ্রীষ্টান।

ভূ-প্রকৃতি ঃ ত্রিপুরা ভারতের পূর্বসীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলের উপর অবস্থিত ; সেইজন্য ইহার ভূ-প্রকৃতি স্বভাবতঃ পাহাড়ময়। বড়মুড়া, আঠারমুড়া, লংতরাই, বেলকম, শাখানটাং, জাম্পুটাং, দেবতামুড়া, কালাঝারি প্রভৃতি পাহাড় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পাহাড়গুলি সবই উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। পাহাড়গুলির মধ্যে মধ্যে নিম্ন উপত্যকা সমভূমি আছে। এখানে অনেক উঁচু টিলাও আছে। দুইটি টিলার মধ্যবর্তী নিম্ন সমভূমিকে লুঙ্গা বলে।

উপত্যকাভূমির মধ্য দিয়া রাজ্যের সব নদীগুলি প্রবাহিত।

নদ-নদী ঃ গোমতী, খোয়াই, মনু, হাওড়া, ফেনী, ধলাই, জুরি প্রভৃতি এই রাজ্যের কয়েকটি বিশিষ্ট নদী—এইগুলি সবই পার্বত্য নদী।



ত্রিপুরা—প্রাকৃতিক।

গোমতী নদী লংতরাই পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়া তীর্থমুখ, অমরপুর, উদয়পুর, সোনামুড়া হইয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। গোমতী ত্রিপুরার দীর্ঘতম নদী। **খোয়াই** আঠারমুড়া পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়া তেলিয়ামুড়া, কল্যাণপুর, খোয়াই-এর পার্শ্ব দিয়া বাংলাদেশে গিয়াছে। **মনু** শাখানটাং পাহাড় হইতে বাহির হইয়া কৈলাসহরের পার্শ্ব দিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। **দেও** তাহার শাখানদী। **হাওড়া** বড়মুড় পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়া জিরাণীয়া, রাণীর বাজার, আগরতলার পার্শ্ব দিয়া বাংলাদেশে গিয়াছে। **ফেনী** পার্বত্য অঞ্চলে জন্মলাভ করিয়া সাব্রুমের পার্শ্ব দিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। **ধলাই** লংতরাই পাহাড় হইতে বাহির হইয়া কুলাই, হালাতালি, কমলপুরের পাশ দিয়া বাংলাদেশে গিয়াছে। **জুরি** জাম্পুই পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া ধর্মনগরের পাশ দিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে।

লক্ষ্য করিবে, নদীগুলি সবই বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে, কারণ রাজ্যের পশ্চিমদিক বেশী ঢালু। হেমন্তকালে নদীগুলিতে জল বেশী থাকে না, কিন্তু বর্ষাকালে পাহাড় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হইলে উহারা পূর্ণ থাকে ও তখন খরস্রোতা।

জলবায়ুঃ ত্রিপুরা মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। মৌসুমী বায়ু-প্রবাহে বর্ষাকালে এখানে অঝোর ধারায় বৃষ্টিপাত হয়। সারা বৎসরে গড় বৃষ্টিপাত 100 ইঞ্চি বা 254 সেন্টিমিটার।

গ্রীষ্মকালে এখানে বেশ গরম পড়ে; আবার শীতকালে পাহাড়িয়া অঞ্চলে খুব শীত পড়ে, অবশ্য বরফ পড়ে না। মোটের উপর জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ।

মনুষ্য ভৌগোলিক সংস্থানঃ অধিবাসীদের মধ্যে অনেকে সমভূমিতে বা শহরাঞ্চলে বাস করেন; কিন্তু পাহাড়িয়া অঞ্চলের আদিবাসীরা অনেকে বাস করেন টঙঘরে। টঙঘরের নীচে খুঁটি

পুঁতিয়া তাহার উপর মাচান বাঁধিয়া ঘর নির্মাণ করা হয় এবং উপরে ছনের ছাউনি থাকে। এরূপ ঘরে উপরে মানুষ বাস করে এবং নীচে শূকর ইত্যাদি পালিত হয়। টঙঘর একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া যায়।



টঙঘর।

উৎপন্ন দ্রব্যাদি ঃ

বনজ ঃ অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য পাহাড়িয়া অঞ্চল শাল, সেগুন, ছাতিম, গর্জন, নাগেশ্বর, চাম্বল, গাম্ভারী, শিমুল বৃক্ষের অরণ্যে ঢাকা। পাহাড়ে সর্বত্রই নানারকমের প্রচুর বাঁশ জন্মে। কাগজ শিল্পে ও ছাতার বাঁট প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য বাঁশ রপ্তানী হয়।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য, ত্রিপুরার বনভূমিতে বর্তমানে কফি, রবার, চন্দন, ইউকেলিপটাস প্রভৃতি বৃক্ষ ও সর্পগন্ধা প্রভৃতি ঔষধির চাষ আরম্ভ হইয়াছে।

ত্রিপুরার জঙ্গলে ব্যাঘ্র, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হাতী, চিতাবাঘ, হরিণ, ভল্লুক, বন্যমহিষ প্রভৃতি জন্তু এবং পাইথন, অজগর ও গোখুরা জাতীয় বিষধর সর্প বাস করে।

কৃষিজঃ ধান ও পাট ত্রিপুরার প্রধান কৃষিজ দ্রব্য, ত্রিপুরার জলবায়ু ইহার উপযোগী। এইগুলি ব্যতীত তিল, সরিষা প্রভৃতি



রবার বৃক্ষের চাষ।

তৈলবীজ ; মুগ, মটর, কলাই, অড়হর প্রভৃতি ডাল ; আলু, ইক্ষু প্রভৃতি প্রায় সব জেলায়ই উৎপন্ন হয়। বিলোনিয়ায় প্রচুর আলু উৎপন্ন হয়। সাব্রুম, উদয়পুর, বিলোনিয়া, সোনামুড়ায় প্রচুর ইক্ষু জন্মে। ত্রিপুরার টিলাভূমিতে চা-ও উৎপন্ন হয়। এখানে মোট 55টি চা-বাগান আছে।

ত্রিপুরায় টিলার উপরে পাহাড়ীরা জুমচাষ করে। জুম প্রথায় প্রথমে জঙ্গল কাটিয়া পুড়াইয়া ফেলা হয়। তারপর বৃষ্টি হইলে স্থানে স্থানে গর্ত খুঁড়িয়া তাহাতে বীজ পুঁতিয়া দেওয়া হয়, বা গাছ

রোপণ করা হয়। জুমচাষে নিকৃষ্ট শ্রেণীর তূলা, শাক-সব্জি, কমলা-লেবু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ইহাতে ফসল ভাল হয় সত্য, কিন্তু জঙ্গল পুড়াইয়া দেওয়ার জন্য বনসম্পদের যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং জঙ্গলের



ত্রিপুরার জীবজন্তু—ব্যাঘ্র, হস্তী, চিতাবাঘ, ভল্লুক, হরিণ, বন্যমহিষ, অজগর।

অভাবে মৃত্তিকার ক্ষয় হইয়া কৃষির অবনতি হয়; আরও যে, ইহার

ফলে জঙ্গল না থাকায় বৃষ্টির জল দাঁড়াইতে না পারিয়া বন্যাও বেশী হয়। এই সব কারণে আজকাল জুমচাষ ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছে বা বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

ত্রিপুরা রাজ্যে নানাপ্রকার ফল উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে আনারস, কমলালেবু, কলা প্রধান। জাম্পুই পাহাড়ের কমলালেবু বিখ্যাত।

খনিজ: বড়মুড়া পাহাড়ে খনিজ তৈল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য ভারতীয় অয়েল অ্যাণ্ড ন্যাচারেল গ্যাস কমিশনের তত্ত্বাবধানে এই সম্পর্কে তৈলকূপের সাহায্যে অনুসন্ধান চলিতেছে।

শিল্পজ: ত্রিপুরায় যন্ত্রশিল্প এখনও প্রসার লাভ করে নাই, তবে কুটির-শিল্প বিশেষ উন্নত।

কুটির-শিল্পের মধ্যে বাঁশ ও বেতের সৌখীন জিনিস; বস্ত্র-শিল্পে তাঁতের কাপড়—রিয়া, পাছড়া, ছবড়া উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরার সিল্ক ও রেশম শিল্পও উন্নতিশীল। বিশ্রামগঞ্জে ও চম্পকনগরে রেশমকীটের গুটি পোকার চাষ হয়। গুটি পোকার খাদ্যের জন্য এখানে তুঁত গাছ জন্মানো হয়—তুঁত গাছের পাতা গুটি পোকার খাদ্য।

হাতের তৈয়ারী কাগজ আরও একটি উল্লেখযোগ্য কুটির-শিল্প।

যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা: ত্রিপুরা তিনদিকেই বাংলাদেশ দ্বারা বেষ্টিত। একমাত্র উত্তর-পূর্বদিকে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সহিত আসামের মধ্য দিয়া ইহা সংযুক্ত।

স্থলপথ বা সড়ক: আসাম-আগরতলা রোড ত্রিপুরাকে আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। ইহা আগরতলা হইতে রাণীর-বাজার, তেলিয়ামুড়া, ডলুবাড়ি, মনু, কুমারঘাট, চোরাইবাড়ি হইয়া আসামের কাছাড় জেলার পামারকান্দি দিয়া করিমগঞ্জ পর্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তাটি ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান অবলম্বন। এই পথেই ভারত হইতে ত্রিপুরায় ট্রাক যোগে মালপত্র

আমদানী-রপ্তানী হয় এবং মোটর বা বাস দ্বারা পার্বত্য পথে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে প্রায় সর্বত্র যাতায়াত সম্ভব।

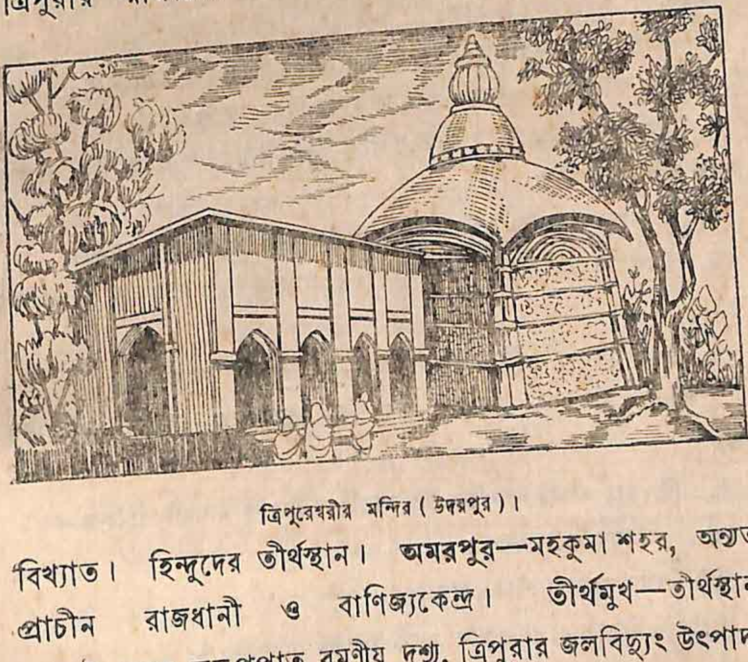
রেলপথ : এই রাজ্যে মাত্র 12 কিলোমিটার রেলপথ আছে—ত্রিপুরার ধর্মনগর হইতে আসামে কাছাড় জেলার কলকলিঘাট পর্যন্ত ইহা গিয়াছে। ইহার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের সহিত ভারতের সরাসরি রেলপথ সংযোগ সম্পূর্ণ হইয়াছে; ফলে ভারত হইতে পণ্যদ্রব্য চলাচল ও যাতায়াত অনেকটা সুগম হইয়াছে।

বিমানপথ : আসাম-আগরতলা রোড-এ বর্ষাকালে প্রায়ই ধস্ নামে; সেইজন্য তখন তাহা যাতায়াতের পক্ষে অসুবিধাজনক এবং বিপজ্জনকও। দ্বিতীয়তঃ, ভারতে আসা-যাওয়া সম্পর্কে রেলপথে আসামের মধ্য দিয়া যাতায়াত অনেক ঘোরা-পথ এবং তাহা সময়সাপেক্ষ। সেইজন্য যাতায়াত ব্যবস্থায় ত্রিপুরাকে অনেকখানি বিমানপথের উপর নির্ভর করিতে হয়। বহির্জগতের সঙ্গেও বিমান-পথেই সংযোগ নির্ভরযোগ্য। আগরতলার উপকণ্ঠে সিঙ্গারবিলে বিমানবন্দর অবস্থিত।

প্রধান প্রধান শহর ও প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ :

আগরতলা : ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান শহর, রাজধানী ও বাণিজ্য-কেন্দ্র। এই শহরের বুদ্ধ মন্দির, যাদুঘর এবং উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ বিখ্যাত ও দ্রষ্টব্য স্থান। এখানে একটি সুন্দর কলেজ আছে। **ধর্মনগর**—উত্তর সীমান্তে মহকুমা শহর, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ও ত্রিপুরার প্রান্তিক রেল-স্টেশন। **কৈলাসহর**—মহকুমা শহর, মনু নদীর তীরে অবস্থিত, বাণিজ্যকেন্দ্র ও বিমানবন্দর। ইহার নিকটে উনকোটি পাহাড়ে খোদাই করা অনেক মূর্তি আছে। চৈত্রমাসে অষ্টমীতে একটি বড় মেলা হয়। **কমলপুর, খোয়াই** বিভিন্ন মহকুমা শহর। **অরুন্ধতীনগর**—শিল্প-উপনগরী। **সোনামুড়া**

মহকুমা শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। মেলাঘর—এখানের রুদ্রসাগরে রাজাদের তৈয়ারী নীরমহল দ্রষ্টব্য। রুদ্রসাগর মৎস্যচাষের জন্য বিখ্যাত। উদয়পুর—গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত মহকুমা শহর, ত্রিপুরার রাজাদের রাজধানী। উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির



ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির (উদয়পুর)।

বিখ্যাত। হিন্দুদের তীর্থস্থান। **অমরপুর**—মহকুমা শহর, অন্যতম প্রাচীন রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **তীর্থমুখ**—তীর্থস্থান। কাছেই ডম্বুর জলপ্রপাত রমণীয় দৃশ্য, ত্রিপুরার জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র ; ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল। **দেবতামুড়ায়** পাহাড়ে পাথরের অনেক মূর্তি আছে। **বিলোনিয়া**—দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত মহকুমা শহর। **সাব্রুম**—মহকুমা শহর, বাণিজ্যকেন্দ্র। এইগুলি ব্যতীত পানিসাগর, মনুঘাট, মাণিকভাণ্ডার, কল্যাণপুর, বিশালগড়, রাণীরবাজার, চম্পকনগর, বিশ্রামগড়, অম্পি, শান্তিরবাজার, মনুবাজার প্রভৃতি আরও কয়েকটি শহর এবং ব্যবসাকেন্দ্র এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্নাবলী

(A)

1. ত্রিপুরার ভূ-প্রকৃতি আলোচনা কর।

ত্রিপুরার কয়েকটি নদীর নাম বল এবং উহাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

2. ত্রিপুরার অধিবাসীদের সম্পর্কে সাধারণভাবে উহাদের নাম, সংখ্যা, ধর্ম, ভাষা ও জীবনযাত্রাপ্রণালী সম্বন্ধে সাধারণ বিবরণ দাও।

3. ত্রিপুরার জলবায়ু ও সেই সম্পর্কে নির্ভরশীল বনজ ও কৃষিজ সম্পদ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

(ii) ত্রিপুরার খনিজ ও শিল্পজ সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা কর।

4. ত্রিপুরার যোগাযোগ ও পরিবহন সম্পর্কে তোমার মতামত প্রকাশ কর।

5. নিম্নলিখিতগুলি কি, কোথায় এবং কি জন্য বিখ্যাত ? —

আগরতলা, ধর্মনগর, বড়মুড়া, উদয়পুর, মনুবাজার, মেলাঘর, তীর্থমুখ, সাব্রুম।

6. ত্রিপুরার একটি মানচিত্র অঙ্কন করিয়া নিম্নলিখিতগুলি চিহ্নিত কর :

(i) ধর্মনগর ও রেলপথ ;

(ii) আগরতলা-আসাম রোড ;

(iii) লংতরাই বা যে-কোন একটি পাহাড় (নামসহ) ;

(iv) গোমতী নদী ;

(v) আগরতলা, কৈলাসহর, বিলোনিয়া।

(B)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী : Objective Tests

(নির্দেশ পূর্ববৎ)

1. Recall Type :

(a) ত্রিপুরা — খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। ———

(b) — ত্রিপুরার রেল স্টেশন।

2. Completion Type :

ত্রিপুরার অধিকাংশের মাতৃভাষা—— (1) । ——(1)
এবং এখানে শিক্ষার —— (2) উল্লেখযোগ্য । ——(2)
ত্রিপুরায় —— টি (3) কলেজ ও অনেক বিদ্যালয় ——(3)
আছে। দেশের শিক্ষিতের হার শতকরা —— (4) জন। ——(4)

3. Alternate Response Type :

(a) True or False Type :

(i) ত্রিপুরার পাহাড়গুলি হিমালয়ের মত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। ——
(ii) ত্রিপুরায় খনিজ তৈলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। ——

(b) Yes or No Type :

(i) ত্রিপুরা কি সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত ? ——
(ii) ত্রিপুরায় কি রবারের চাষ হইতে পারে ? ——
(c) ত্রিপুরায় কি জলবিদ্যুতের কোন সম্ভাবনা আছে ? ——

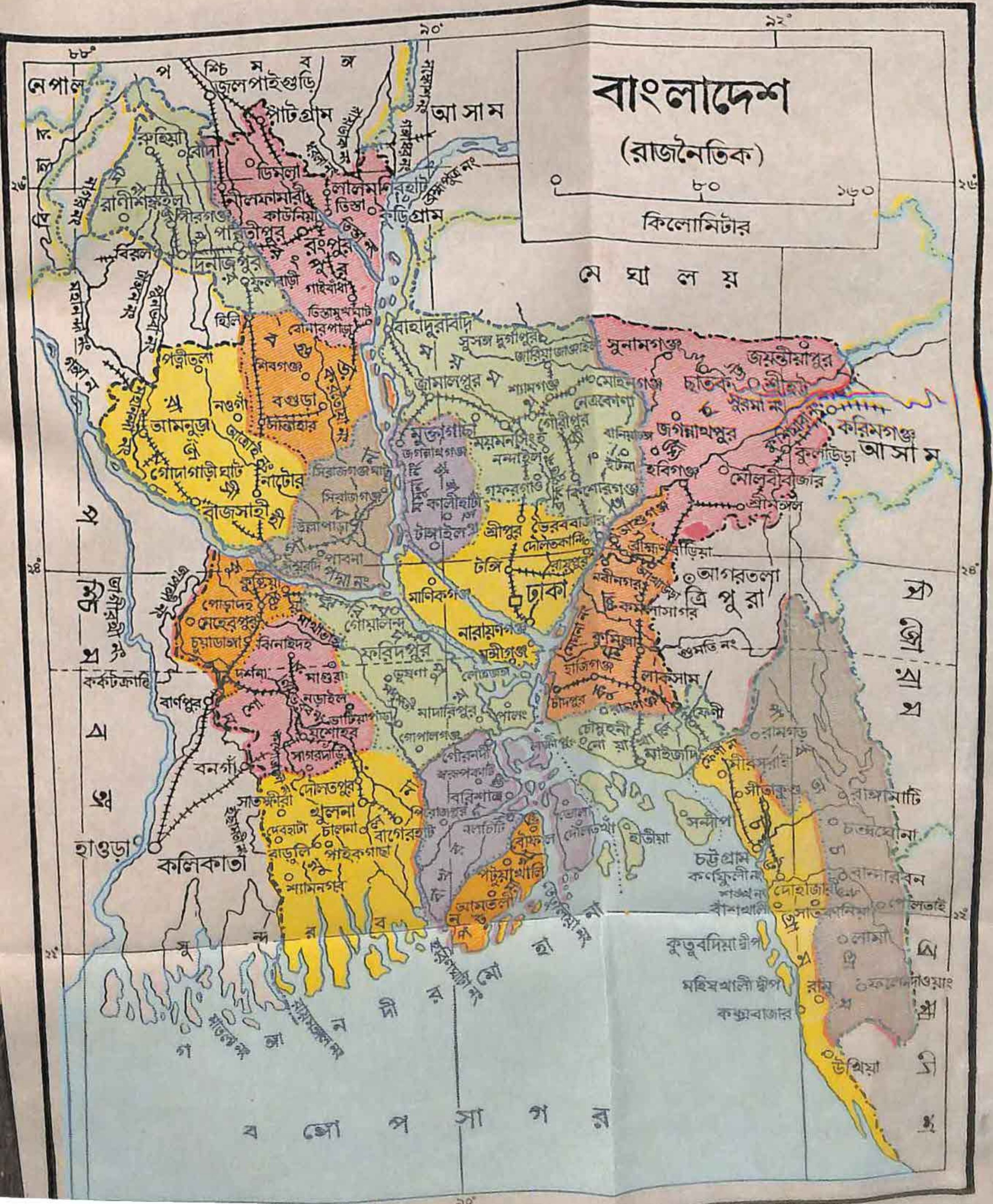
4. Multiple Choice Type :

(1) ত্রিপুরার অরণ্য সম্পদ উল্লেখযোগ্য, কারণ,
 (a) ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল প্রচুর ;
 (b) ইহা মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্গত ;
 (c) ইহার অরণ্য সম্পদ অক্ষতই আছে ;
 (d) জুমচাষে অরণ্যের উপকার হয় ;
 (e) উপরোক্ত কোনটিই প্রযোজ্য নহে।

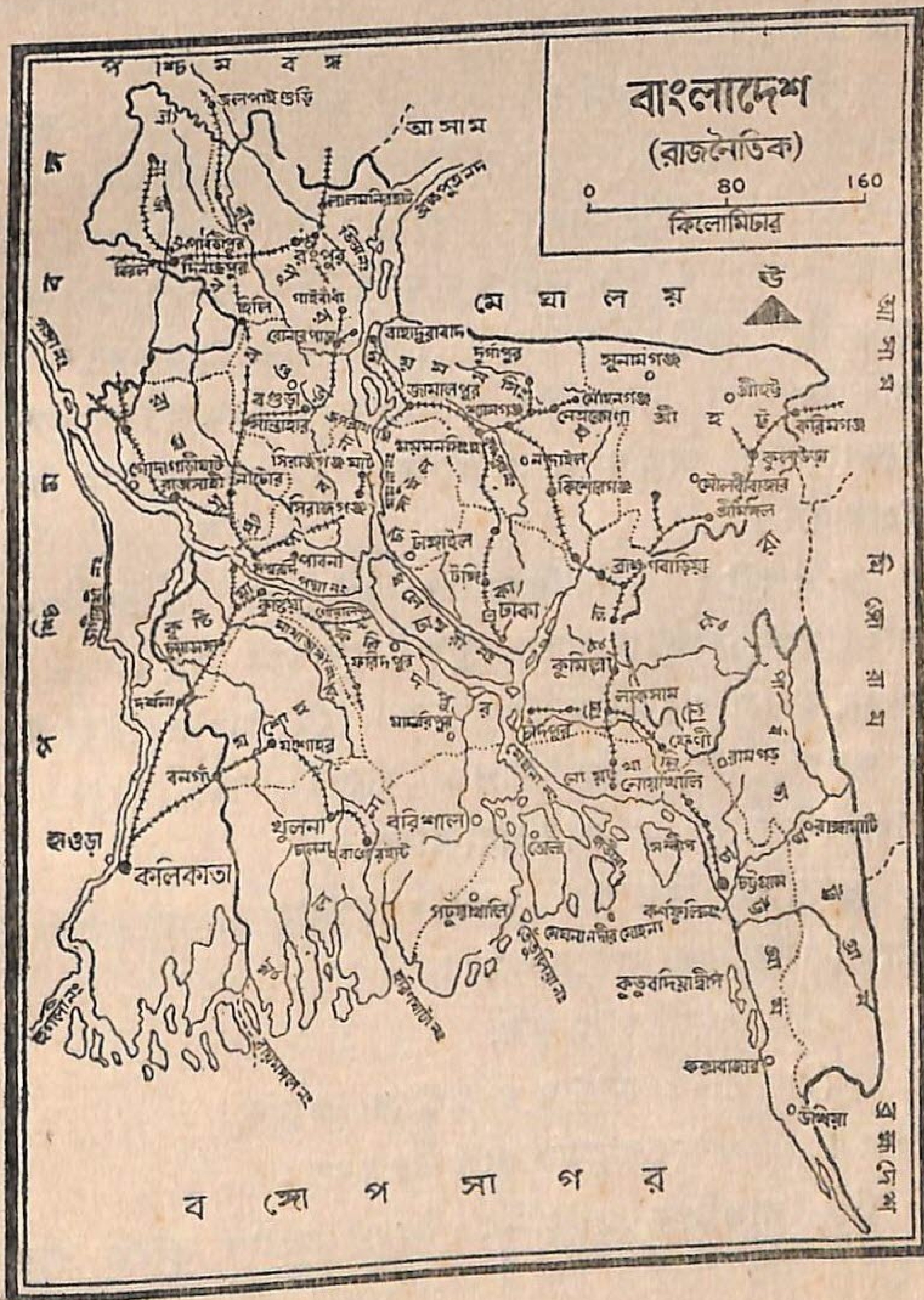
(2) ভারতের মূলভূখণ্ডের সহিত ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ সুষ্ঠু ও সুগম নয়। কারণ, ——
 (a) ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের সুদূর পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ;
 (b) ত্রিপুরা রাজ্য হিমালয়ের পূর্ব শাখার উপর অবস্থিত ;
 (c) মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থিতিজনিত বাধা ;
 (d) উপরোক্ত কোনটিই উপযুক্ত কারণ নহে।

3. বাংলাদেশ

1947 খ্রীষ্টাব্দের 15ই আগষ্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অনুজ প্রতিপক্ষ যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারই পূর্বশাখা পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব-পাকিস্তান নামে অভিহিত ছিল। পাকিস্তান দুইটি বিচ্ছিন্ন অংশ লইয়া গঠিত ছিল—পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তান, মধ্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহস্রাধিক মাইল (1,600 কি.মি. এবং তদূর্ধ্ব)-এর দুস্তর ব্যবধান। পূর্ব-পাকিস্তানের সেদিনের স্বাধীনতা ছিল পরাধানতার নামান্তর। পশ্চিম-পাকিস্তানের শাসন, শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়ন ও অবিচারে ক্রমাগত উত্যক্ত হইয়া পূর্ব-পাকিস্তান অবশেষে পশ্চিম-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথে, রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ইহার পূর্বে ভাষা-আন্দোলনে কত শহীদ হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করিলেন! বাংলা তাঁহাদের মাতৃভাষা—সেই মাতৃভাষার উচ্ছেদসাধনের অপচেষ্টাকে রক্তের দ্বারা তাঁহারা প্রতিরোধ করিলেন। মাতৃভাষার জন্য স্থায়ী আসন নির্দিষ্ট হইল, বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃত হইল। সেদিনের রক্তদান বৃথা হয় নাই; অলক্ষ্যে জাতীয় সংহতি আরও দৃঢ়মূল হইল, জাতি যেন তাহার নিজস্ব শক্তিমত্তায় আস্থা ফিরিয়া পাইল। তাই স্বাধীনতা যুদ্ধে আধুনিক সমরসজ্জায় সজ্জিত দুর্ধর্ষ খানবাহিনীর বিরুদ্ধে, চূড়ান্ত অসম বৈষম্যের সহিত চরম বোঝাপড়ায় তাঁহারা ভীত বা পশ্চাদপদ হন নাই। বিপুল রক্তপাত, নানা ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়া পূর্ববঙ্গ 1971 খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ এই নামে স্বাধীনতা অর্জন করে। এই স্বাধীনতা বহু কষ্টার্জিত। ভারতীয় বাহিনী ও জাতীয় মুক্তি বাহিনীর মিলিত শক্তির নিকট খানবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। এইভাবেই স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতন্ত্ররাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হয়।


বাংলাদেশ
(রাজনৈতিক)
০ ৮০ ১৬০
কিলোমিটার
নেপাল
প শ্চি ম ব ঙ্গ
জলপাইগুড়ি
আসাম
মে ঘা ল য়
পাটগ্রাম
ডিমলা
লালমনিরহাট
নীলফামারী
রাণীশঙ্কৈল
পীরগঞ্জ
পার্বতীপুর
কাউনিয়া
কুড়িগ্রাম
রংপুর
দিনাজপুর
গাইবান্ধা
ফুলবাড়ী
হিলি
বাহাদুরাবাদ
সুসঙ্গ দুর্গাপুর
সুনামগঞ্জ
জয়ন্তীয়াপুর
ছাতক
শ্রীহট্ট
সুরমা নং
করিমগঞ্জ
কুলাউড়া
মৌলবীবাজার
হবিগঞ্জ
শ্রীমঙ্গল
জগন্নাথপুর
পত্নীতলা
নওগাঁ
বগুড়া
শিবগঞ্জ
সান্তাহার
আমনুরা
গোদাগাড়ী ঘাট
নাটোর
রাজসাহী
সিরাজগঞ্জ ঘাট
সিরাজগঞ্জ
পাবনা
জামালপুর
ময়মনসিংহ
নেত্রকোণা
মোহনগঞ্জ
গৌরীপুর
কিশোরগঞ্জ
টাঙ্গাইল
শ্রীপুর
ভৈরববাজার
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
আগরতলা
ত্রি পু রা
টঙ্গি
ঢাকা
মানিকগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ
মুন্সীগঞ্জ
কুমিল্লা
চাঁদপুর
লাকসাম
ফেনী
চৌমুহনী
মাইজদি
কুষ্টিয়া
মেহেরপুর
চুয়াডাঙ্গা
ঝিনাইদহ
মাগুরা
গোয়ালন্দ
ফরিদপুর
মাদারিপুর
গোপালগঞ্জ
নড়াইল
যশোহর
বনগাঁ
সাতক্ষীরা
খুলনা
দৌলতপুর
বাগেরহাট
বরিশাল
পটুয়াখালি
আমতলী
ভোলা
হাতীয়া
সন্দীপ
চট্টগ্রাম
কর্ণফুলী নং
সীতাকুণ্ড
মীরসরাই
রামগড়
রাঙ্গামাটি
চন্দ্রঘোনা
বান্দারবন
দোহাজারী
কুতুবদিয়া দ্বীপ
মহিষখালী দ্বীপ
কক্সবাজার
রামু
উখিয়া
কলিকাতা
হাওড়া
কর্কটক্রান্তি
আ সা ম
ব্র হ্ম দে শ
ব ঙ্গো প সা গ র

বন্ধুত্ব, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং উত্তম প্রতিবেশীসুলভ মনোবৃত্তি ভারত ও বাংলাদেশ—এই উভয় রাষ্ট্রের পক্ষে লাভজনক।



অবস্থান ও আয়তনঃ বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী,

পশ্চিমবঙ্গের পূর্বদিকে অবস্থিত। ইহা দক্ষিণ ব্যতীত প্রায় তিনদিকেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। বাংলাদেশের উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ ও মেঘালয়; পূর্বে আসাম রাজ্য, ত্রিপুরা ও মিজোরাম: দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ।

এই রাষ্ট্রের আয়তন 1·45 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার (55·13 হাজার বর্গমাইল); ইহার সীমান্তরেখার দৈর্ঘ্য 4,712 কিলোমিটার, তন্মধ্যে তটরেখা 716 কিলোমিটার। বর্তমানে লোকসংখ্যা প্রায় 7·50 কোটি—প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে 517 জন; সুতরাং, ইহা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র। বাংলাদেশ লোকসংখ্যায় বিশ্বে অষ্টম স্থান অধিকার করে। চীন, ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, জাপান ও ব্রাজিলের পরেই লোকসংখ্যার বিচারে ইহার স্থান।

অধিবাসী : অধিবাসিগণ প্রধানতঃ মুসলমান ও হিন্দু, তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত; পূর্বাঞ্চলে কিছু বৌদ্ধও বাস করেন, ইহারা বাঙালী, মগ ও চাকমা। ইহা ব্যতীত কিছু খ্রীষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোকও আছেন। সমগ্র রাষ্ট্রের ভাষা সাধারণতঃ বাংলা এবং **রাষ্ট্রভাষা** বাংলা।

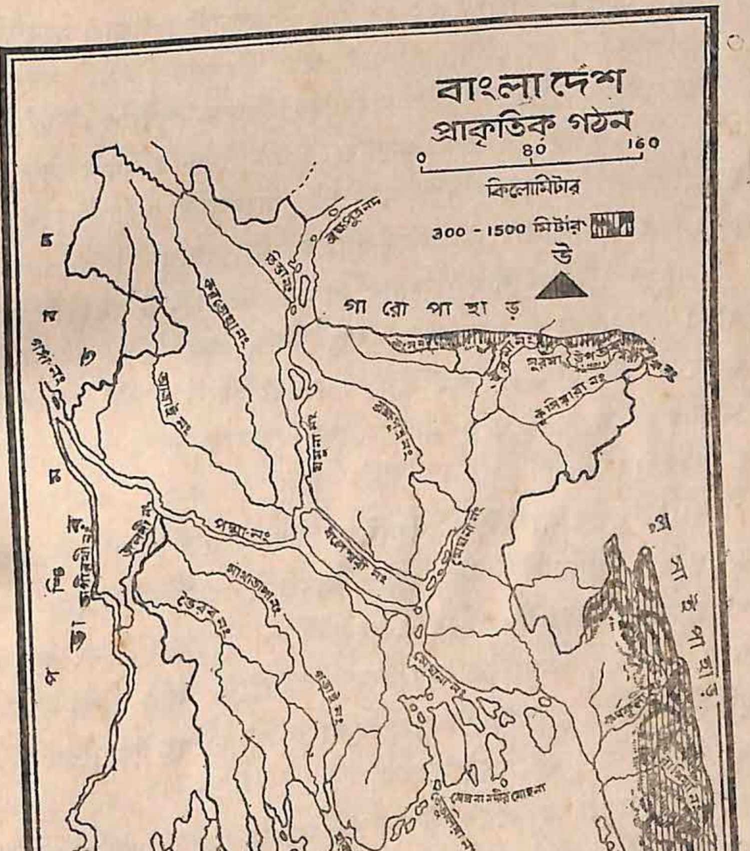
প্রাকৃতিক বিভাগ : ভূপ্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :

(1) পাললিক সমভূমি,

(2) পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার উচ্চভূমি,

এবং (3) দক্ষিণে সমুদ্রোপকূলে নিম্ন সমভূমি।

(1) **পাললিক সমভূমি :** ইহাকে আবার ভূমির প্রকৃতি অনুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, প্রাচীন পাললিক সমভূমি এবং নূতন পাললিক সমভূমি।


বাংলাদেশ
প্রাকৃতিক গঠন
0
80
160
কিলোমিটার
300 - 1500 মিটার
উ
গা রো পা হা ড়
পদ্মা নং
ব ঙ্গো প সা গ র

(i) **প্রাচীন পাললিক সমভূমি :** গঙ্গানদী (পদ্মা) নানাবিধ কারণে ক্রমশঃ পূর্বে সরিয়া যাইতেছে ; সেইজন্য এই সমভূমি পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন পাললিক সমভূমির বিস্তৃত পূর্বাংশ। এঁটেল মাটি গঠিত বরেন্দ্রভূমি ইহার অন্তর্গত। এই সমভূমি অঞ্চল 'মৃত বা মৃতপ্রায় নদী' বা জলাভূমিতে আকীর্ণ। রাজসাহী বিভাগে বিখ্যাত চলন বিল—100 বর্গমাইল—এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মধুপুর (ময়মনসিংহ) অঞ্চলে সামান্য উচ্চ পার্বত্য সমভূমি দেখা যায়। ইহাদিগকে সাধারণতঃ গড় নামে অভিহিত করা হয়। ইহাদের উপযোগিতা এই যে, গঙ্গানদী ইহাদের জন্য আর পূর্বে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। শ্রীহট্ট জেলায় স্থানে স্থানে কিছু টিলা দেখা যায়।

(ii) **নূতন পাললিক সমভূমি :** ইহা সর্বতোভাবে পদ্মা এবং ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটি দিয়া গঠিত সমভূমি, অতিশয় উর্বরা ও শস্যশ্যামলা। নদীগুলি এখনও এখানে বিশেষ কার্যকরী ; বর্ষাকালে অনেক স্থানই জলপ্লাবিত হয় এবং পলিমাটিতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে ; নূতন ব-দ্বীপের সৃষ্টিধারা অব্যাহত থাকে। বয়সের বিচারে ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাই নূতন।

এই সমভূমি অঞ্চলের উত্তরাংশ—ময়মনসিংহ জেলায় গারো পাহাড়ের পাদদেশ অঞ্চল স্বভাবতঃ উচ্চ।

(2) **পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার উচ্চভূমি :** হিমালয় পর্বতের যে অংশ প্রাচীন গণ্ডোয়ানা ভূমির অবলুপ্তির সময়, তাহার চাপে দক্ষিণে বাঁকিয়া গিয়াছে, তাহারই কিয়দংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। ইহার ঠিক পূর্বদিকে মিজোরামের লুসাই এবং আরাকান য়োমা।

(3) **দক্ষিণে সমুদ্রোপকূলের নিম্ন সমভূমি :** দক্ষিণে সমুদ্রো-

পকূলের সুন্দরবন অঞ্চল এই অংশের অন্তর্গত; ইহা খাড়ি ও দ্বীপবহুল। মহিষখালি, কুতুবদিয়া, হাতিয়া, সন্দীপ প্রভৃতি দ্বীপ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

নদ-নদী ঃ বাংলাদেশ প্রকৃতই নদীমাতৃক ঃ **পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা** ও **কর্ণফুলি** ইহার প্রধান নদ-নদী। **মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ, ভৈরব, কপোতাক্ষ, মাথাভাঙ্গা** প্রভৃতি পদ্মার বিভিন্ন শাখানদী। সেইরূপ **তিস্তা, করতোয়া, আত্রেয়ী,** ব্রহ্মপুত্রের (যমুনার) উপনদী এবং **ধলেশ্বরী,** বুড়ীগঙ্গা, শীতলাক্ষ্যা উহার উল্লেখযোগ্য শাখানদী।

পদ্মা ঃ গঙ্গানদী ভারতের উপর দিয়া পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলায় ধুলিয়ানের নিকট দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া ভাগীরথী নামে প্রবাহিত হইয়াছে; কিন্তু উহার মূলধারা পদ্মা নামে রাজসাহীর (রামপুর-বোয়ালিয়া) কিছু দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমা নির্ধারণ করিয়া বাংলাদেশের উপর দিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত। গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যমুনা ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং এই সম্মিলিত স্রোত পদ্মা নামে ক্রমে দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়াছে। চাঁদপুরের নিকট **মেঘনা** নদী ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং তারপর হইতেই ইহা মেঘনা নাম ধারণ করিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের বিশাল ব-দ্বীপের অধিকাংশই বাংলাদেশে অবস্থিত।

ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা ঃ ব্রহ্মপুত্র নদ রংপুর জেলায় কুড়িগ্রামের নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে, পরে দেওয়ানগড়ের উত্তরে ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ করিয়া ময়মনসিংহ শহরের পূর্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জের নিকট ইহা মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যমুনা তারুণ্যের উদ্দামতায় ব্রহ্মপুত্র অপেক্ষা

অধিকতর চঞ্চল ও শক্তিশালী। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, যমুনা গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে।

মেঘনা : বরাক নদী ভারতের নাগা পাহাড় অঞ্চলে জন্মলাভ করিয়া প্রথমে মণিপুর রাজ্য ও পরে আসামের কাছাড় জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই জেলায় বদরপুরের নিকট সুরমা ও কুশীয়ারা নামে দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। শ্রীহট্ট জেলার পশ্চিমাংশে নদী দুইটি পুনরায় মিলিত হইয়া কালনী নামে প্রবাহিত হইয়াছে। এই সময় ডানদিক হইতে **ধলেশ্বরী** আসিয়া উহার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সম্মিলিত প্রবাহ পরে মেঘনা নামে কিছুদূর প্রবাহিত হইয়া পদ্মার সহিত চাঁদপুরের নিকট মিলিত হইয়াছে এবং সমগ্র জলধারা মেঘনা নামেই দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

মেঘনার মোহানায় সাগর-সঙ্গমের বিস্তৃতি প্রায় 29 মাইল বা প্রায় 48·33 কিলোমিটার। স্বর্গতঃ প্রখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ মেঘনাদ সাহার মতে, পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার সম্মিলিত ধারা পৃথিবীর বৃহত্তম নদী বা জলধারা—অর্থাৎ ইহা যত কিউসেক (cusec—কিউবিক বা ঘন ফিট প্রতি সেকেণ্ডে) জল বহন করে, পৃথিবীর কোন নদীই ইহার সমতুল্য নহে। অবশ্য ভৌগোলিকদের মতে দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদই বৃহত্তম।

কর্ণফুলি : মিজোরামের লুসাই পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়া কর্ণফুলি নদী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে।

উষ্ণপ্রস্রবণ : চট্টগ্রাম জেলায় সীতাকুণ্ড উষ্ণপ্রস্রবণ, বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা হিন্দুদের নিকট একটি তীর্থক্ষেত্র।

সেচব্যবস্থা ও জলবিদ্যুৎ : বাংলাদেশে নদীপ্রাচুর্য এবং অধিক

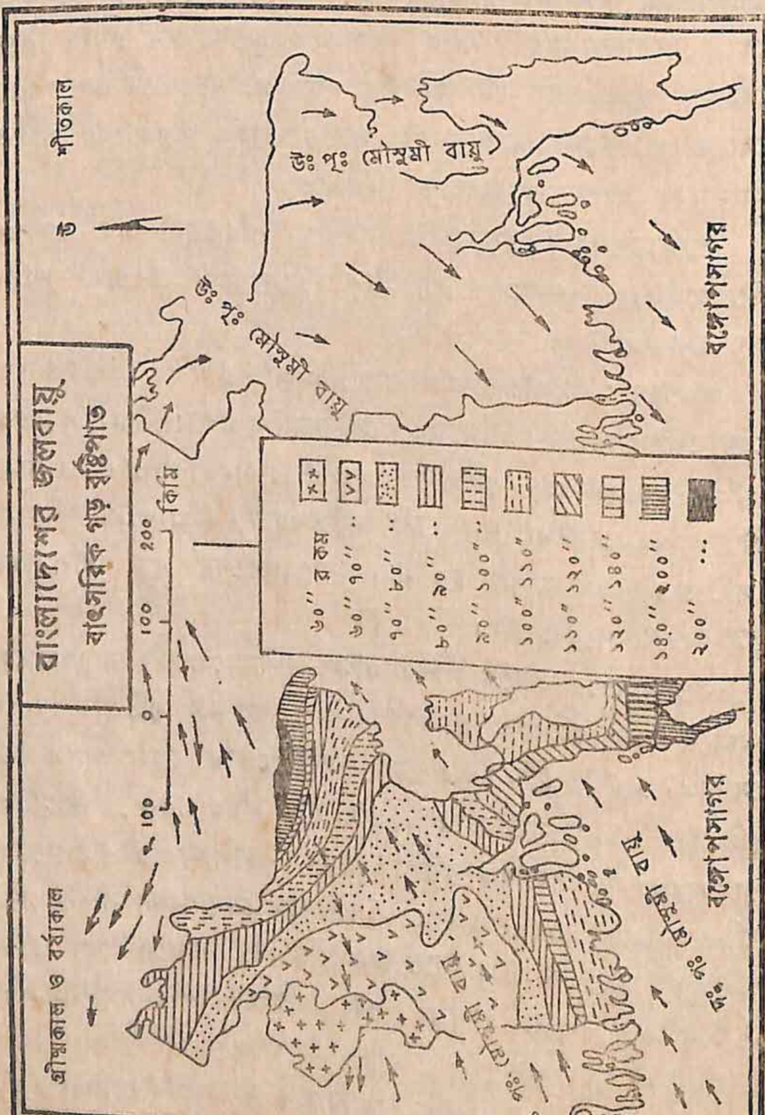
বৃষ্টিপাতের জন্য সাধারণতঃ সেচের জলাভাব হয় না, সেইজন্য কোন সেচব্যবস্থা নাই। তবে উত্তরাঞ্চলে কূপের জল হইতে কিছু সেচকার্য চলে এবং এই অঞ্চলের জন্য গঙ্গানদী হইতে জল লইয়া সেচের পরিকল্পনা আছে—এই সম্বন্ধে ভারত সরকারের সহিত বাংলাদেশ সরকারের কথাবার্তা চলিতেছে।

বাংলাদেশের কর্ণফুলী জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এখানে 20,200 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়।

জলবায়ু : বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ-আর্দ্র হইলেও (কর্কটক্রান্তি রেখা দেশের মধ্য দিয়া গিয়াছে, সেইজন্য স্বভাবতঃ উষ্ণ) সমুদ্রের সান্নিধ্যহেতু এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য প্রায় সমভাবাপন্ন। এখানে শীতাতপের তারতম্য 10°—12° ফারেনহাইট (প্রায় 5·5°—6·6° সেন্টিগ্রেড)-এর অধিক হয় না। বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা 57°—60° ফারেনহাইট।

বঙ্গোপসাগর হইতে আগত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অধিকাংশ স্থানেই বৃষ্টিপাত 130 সেন্টিমিটার (75 ইঞ্চি)-এর বেশী এবং কোন কোন স্থানে গড় বৃষ্টিপাত 254 সেন্টিমিটার (100 ইঞ্চি)-এর বেশী; শ্রীহট্টের পার্বত্যঅঞ্চলেই সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। কলিকাতায় বৃষ্টিপাতের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, কলিকাতায় যেখানে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত 160 সেন্টিমিটার (63 ইঞ্চি), ঢাকায় সেখানে প্রায় 254 সেন্টিমিটার (100 ইঞ্চি) এবং শ্রীহট্টে 406 সেন্টিমিটার (160 ইঞ্চি)।

দেশের স্থলভাগ ও নদীপ্রমুখ বিস্তীর্ণ জলভাগের সান্নিধ্যহেতু, গ্রীষ্ম ও শীতকালের প্রারম্ভে ভূভাগের উত্তাপের তারতম্যহেতু


বাংলাদেশের জলবায়ু
বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত
গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকাল
শীতকাল
উঃ পূঃ মৌসুমী বায়ু
বঙ্গোপসাগর
কিমি

ভূভাগ জল অপেক্ষা অধিকতর শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং তেমনই শীঘ্র শীতলও হয়। দেশে গ্রীষ্মে কাল-বৈশাখী ও আশ্বিনে ঝড়বৃষ্টি ও ঘূর্ণবাত হয়। তাহা ছাড়া দেশের ভৌগোলিক অবস্থানহেতু, বঙ্গোপসাগরে বর্ষাকালে মধ্যে মধ্যে যে নিম্নচাপের (depression—ডিপ্রেসন-এর) সৃষ্টি হয় তাহার ফলে কখনও কখনও সাইক্লোনিক ঝটিকা প্রবাহে বৃষ্টি ও বন্যা হইয়া থাকে এবং ক্ষয়ক্ষতি ও লোকের দুর্দশার তখন কোন সীমা থাকে না।

উৎপন্ন দ্রব্য ঃ

স্বাভাবিক উদ্ভিজ বা অরণ্যজ ঃ বাংলাদেশের শতকরা প্রায় 16·62 ভাগ স্থান অরণ্য। এখানে উত্তাপ এবং সেই সঙ্গে অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য পার্বত্যঅঞ্চলসমূহ অরণ্যময়, চিরহরিৎবৃক্ষের অরণ্যে আবৃত। চট্টগ্রামের পার্বত্য অরণ্যে গোমা, গর্জন, জারুল প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। ময়মনসিংহের মধুপুর গড় জঙ্গলে ও ঢাকার ভাওয়ালের অরণ্যে গজারী নামক এক শ্রেণীর শালগাছ পাওয়া যায়। দিনাজপুরে স্থানে স্থানে শালবন আছে। দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে সুন্দরী, গরাণ, গেঁউয়া প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। ইহা গভীর অরণ্য অঞ্চল। ইহা ব্যতীত দেশের প্রায় সর্বত্রই উষ্ণ-আর্দ্র আবহাওয়া ও মৃত্তিকার গুণে প্রচুর বাঁশ ও বেত হয়।

দেশের কাষ্ঠ ব্যবসায় বিশেষ কোন উন্নতিলাভ করে নাই। অরণ্যের অধিকাংশ কাষ্ঠ এবং বাঁশ গৃহনির্মাণ বা জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়।

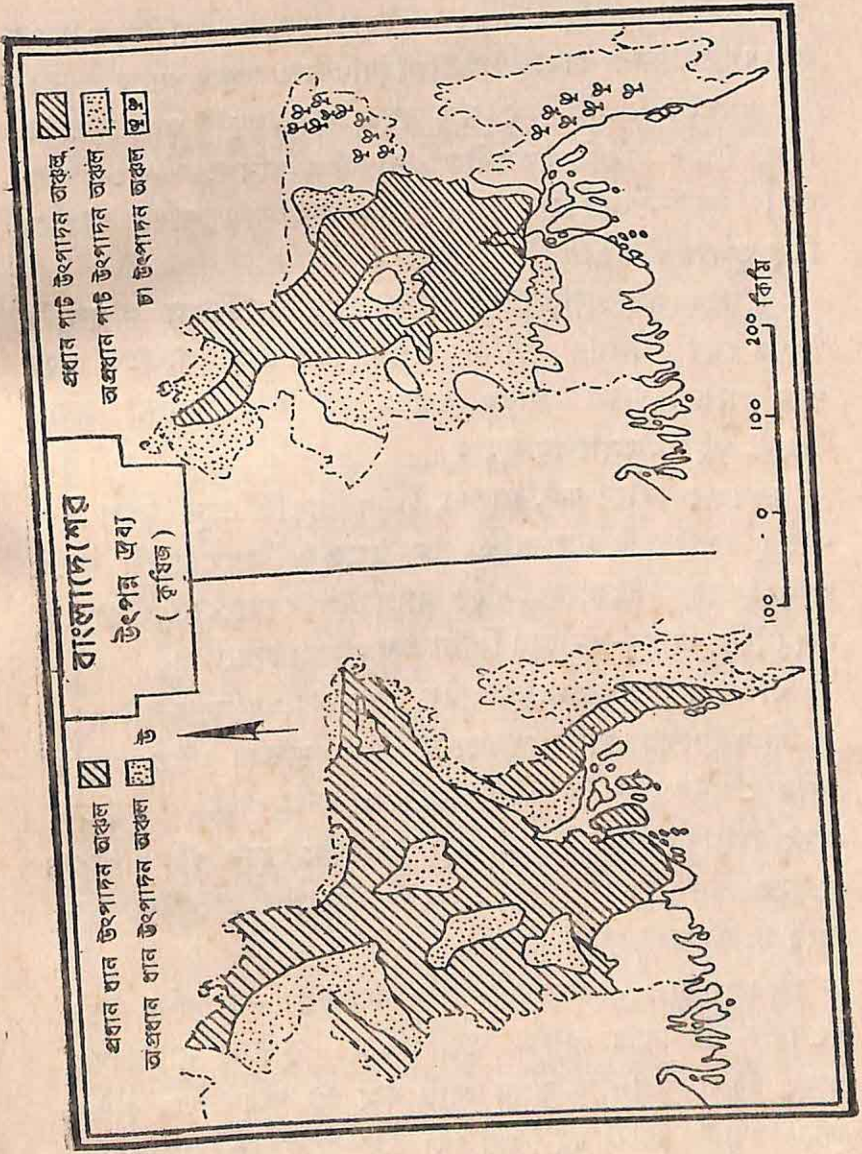
চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে হস্তী পাওয়া যায় এবং সুন্দরবন অঞ্চলে বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার আছে। সুন্দরবন অঞ্চলে মধুসংগ্রহ স্থানীয় অধিবাসীদের অন্যতম উপজীবিকা।

কৃষিজ : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান। উর্বর মৃত্তিকা, প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং নদীজলের প্রাচুর্য দেশের পক্ষে যেন প্রকৃতির এক বিরাট আশীর্বাদ। কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ প্রায় 215 লক্ষ একর। দেশের লোকের অনুপাতে কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ কম বলিয়া ভূমির উপর চাপ অত্যন্ত বেশী। কিন্তু ভূমির উৎপাদিকাশক্তি অত্যন্ত বেশী বলিয়া প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ না হইলে কোন রকমে চলিয়া যাইবার কথা। একমাত্র বরিশাল জেলায় যে পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে, অবিভক্ত বঙ্গদেশের সম্বৎসর চলিয়া যাইত বলিয়া বরিশালকে বাংলার 'শস্য ভাণ্ডার' বলা হইত। অবশ্য এখন বাংলাদেশের লোকসংখ্যা অবিভক্ত বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা অপেক্ষা সামান্য অধিক। বাংলাদেশে **ধান্য ও পাট** প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। ধান্যই বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য এবং প্রায় সর্বত্রই ইহার ব্যাপক চাষ হয়। বেশী বৃষ্টির জন্য এখানে গম ভাল উৎপন্ন হয় না; রাজসাহী, পাবনা, যশোহর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়ায় কিছু গম উৎপন্ন হয়।

পাট : পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। রংপুর, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় নিম্নভূমিতে প্রচুর পাট উৎপন্ন হয়। পাট বাংলা-দেশের প্রধান অর্থকরী ফসল।

চা : চট্টগ্রাম, উত্তর ত্রিপুরা এবং শ্রীহট্টে চা (ভারতের প্রায় এক-সপ্তমাংশ) উৎপন্ন হয়। এখানে প্রায় 145-টি চা-বাগিচা আছে। চা দেশের অন্যতম অর্থকরী কৃষিজ দ্রব্য।

তামাক : রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় বেশ কিছু তামাক উৎপন্ন হয়। রংপুরের তামাকপাতা বিশেষ বিখ্যাত, বর্মা চুরুট প্রস্তুত


বাংলাদেশের
উৎপন্ন দ্রব্য
(কৃষিজ)
প্রধান পাট উৎপাদন অঞ্চল
অপ্রধান পাট উৎপাদন অঞ্চল
চা উৎপাদন অঞ্চল
প্রধান ধান উৎপাদন অঞ্চল
অপ্রধান ধান উৎপাদন অঞ্চল
উ
১০০ ০ ১০০ ২০০ কিমি

করিতে ইহার চাহিদা আছে। ইহাও অন্যতম বাণিজ্যিক উৎপন্ন দ্রব্য। বার্মিজরা তামাকপাতা কিনিবার জন্য রংপুরে আসে।

এইগুলি ব্যতীত ইক্ষু, মুগ, মুসুর, মটর প্রভৃতি ডাল; সরিষা, তিল, তিসি প্রভৃতি তৈলবীজ; নানাবিধ রবিশস্য এখানে উৎপন্ন হয়। ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর গড় অঞ্চলে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে কিছু তুলার চাষ হয়।

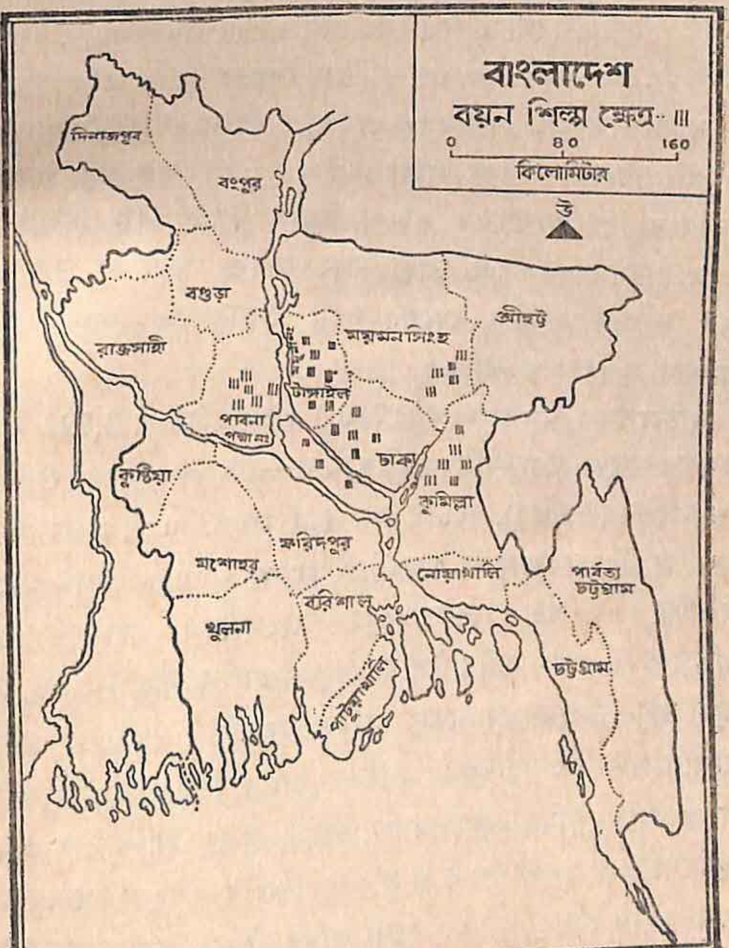
দক্ষিণে সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানে প্রচুর **নারিকেল** ও **সুপারি** উৎপন্ন হয়। সুপারি বাণিজ্যিক রপ্তানী দ্রব্য। বাংলাদেশে প্রচুর **পান** পাওয়া যায়। পানও অন্যতম বাণিজ্যিক রপ্তানী দ্রব্য। শ্রীহট্টে প্রচুর **কমলালেবু** জন্মায়।

জলজ ঃ নদীতে রুই, কাতলা, ইলিশ প্রভৃতি প্রচুর মৎস্য ধরা পড়ে। প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যের বিশেষ চাহিদা আছে বলিয়া ভারত সরকারের সহিত বাংলাদেশ সরকারের এই সম্পর্কে ব্যবসায়িক আদান-প্রদানের ভিত্তিতে কথাবার্তা চলিতেছে।

খনিজ দ্রব্য ঃ বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ নহে। বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানই পলল মৃত্তিকা গঠিত সমভূমি, কোন কোন স্থানে ইহা 1000 ফিটেরও অধিক গভীর। পশ্চিম-বঙ্গের সমভূমি অঞ্চলের মত সেখানে সাধারণতঃ কোন খনিজ সম্পদ থাকিতে পারে না। একমাত্র পার্বত্য শ্রীহট্টে প্রাকৃতিক গ্যাস ইহার উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ।

শিল্পজ দ্রব্য ঃ বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে উন্নত নহে বলিয়া ইহার শিল্পসমৃদ্ধি প্রধানতঃ কৃষিজ দ্রব্যভিত্তিক। কুষ্টিয়া, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে **পাট কল** 42, নারায়ণগঞ্জ, কুষ্টিয়া, খুলনা প্রভৃতি স্থানে **কাপড়ের কল** 22; সেতাবগঞ্জ, গোপালপুর, দর্শনা প্রভৃতি স্থানে **চিনির কল** 7; পার্বত্য চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনা ও

খুলনায় ২টি কাগজের কল আছে। তাহা ছাড়া কাচ-শিল্প, চট্টগ্রামের লৌহ-শিল্প এবং খনিজ তৈল পরিশোধন শিল্প; ছাতকের



সিমেন্টের কারখানা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত অ্যালুমিনিয়াম কারখানা, সিগারেট ও মেসিন টুল নির্মাণের কারখানা, চর্ম-

শোধন (ট্যানিং) শিল্প এবং ছোট-বড় অন্যান্য কারখানাও কিছু সংখ্যক আছে।

কুটীর-শিল্প হিসাবে ঢাকা, টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানের তাঁতের শাড়ী-কাপড়, ঢাকার শাঁখা ও শঙ্খ-শিল্প, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার, ইসলামপুরের পিতল-কাঁসার বাসন, কুমিল্লার বেতের জিনিস উল্লেখযোগ্য।

যাতায়াত ও পরিবহন-ব্যবস্থা : বাংলাদেশ নদীবহুল এবং নদীগুলি বিরাট ও স্থান পরিবর্তনশীল। সেই জন্য সুষ্ঠু যাতায়াত ব্যবস্থা বা যোগাযোগের জন্য ইহাদের উপর সেতু নির্মাণ করা যেমন ব্যয়সাপেক্ষ এবং তাহা রক্ষা করাও ততোধিক ব্যয়সাধ্য। তাই জলপথ ব্যতীত দেশের সর্বত্র যাতায়াতের জন্য অবিচ্ছিন্ন রেলপথ বা রাজপথ নাই।

রেলপথ : বাংলাদেশে 2,739 কিলোমিটার বা 1,722 মাইল রেলপথ আছে। ইহা বিবিধ শ্রেণীর, যথা—ব্রড গজ (Broad Gauge, বড় মাপের বিস্তৃতির), মিটার গজ (Metre Gauge, মধ্যম মাপের বিস্তৃতির) এবং ন্যারো গজ (Narrow Gauge, ছোট মাপের বিস্তৃতির)। এই রেলপথসমূহ **বাংলাদেশ রেলপথ** নামে অভিহিত। পদ্মা নদীর উপরে সেতু (হার্ডিঞ্জ ব্রিজ) আছে, কিন্তু যমুনা নদীর উপরে কোন সেতু নির্মিত হয় নাই ; সেইজন্য রেলপথ সংযোগ এইখানে বিচ্ছিন্ন। তাই যমুনার পূর্বদিকে চট্টগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া কুমিল্লা, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি শহর মিটার গজ রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। নদীর অপর অংশে ভারতের দর্শনা হইতে হলদিবাড়ীর নিকটস্থ ভারত-সীমান্ত বেনাপোল, খুলনা, দর্শনা, গোয়ালন্দ ব্রড গজ রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। অন্যত্র কিছু ন্যারো গজ রেলপথও আছে। উত্তরে সান্তাহার, ঈশ্বরদি, পার্বতীপুর, সৈয়দপুর, লালমণিরহাট, দক্ষিণে যশোহর, খুলনা, ঢাকা, ফরিদপুর,

চট্টগ্রাম প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রেলওয়ে স্টেশন। সৈয়দপুরে একটি রেলওয়ে কারখানা আছে। প্রসঙ্গতঃ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পশ্চাদ্‌পসরণের সময় পদ্মার উপরের বিখ্যাত হার্ডিঞ্জ ব্রিজের দুইটি খিলান বা স্প্যান (Span) ভাঙ্গিয়া দেয়। সম্প্রতি ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ কর্তৃক উহা পুনঃনির্মিত হইয়াছে এবং রেল চলাচলের জন্য সেতুটি উন্মুক্ত হইয়াছে।

এশিয়ান হাইওয়ে: বাংলাদেশে নদী-নালার জন্য পাকা রাস্তা খুব বেশী নাই। এই প্রসঙ্গে বনগ্রাম—যশোহর—গোয়ালন্দ—ঢাকা—চট্টগ্রাম সংযোগকারী রাজপথ একমাত্র উল্লেখযোগ্য।

জলপথ: বাংলাদেশে নদীপথই যাতায়াতের প্রশস্ত উপায়। কতকগুলি নদ-নদীতে নিয়মিতভাবে ষ্টীমার যাতায়াত করে। গোয়ালন্দ-নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ-চাঁদপুর এবং খুলনা-বরিশাল তিনটি প্রধান ষ্টীমার সার্ভিস। গোয়ালন্দ, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ষ্টীমার স্টেশন ও নদী-বন্দর; বাণিজ্যপ্রধান স্থান।

কলিকাতা হইতে জলপথে আসামে বাণিজ্য দ্রব্যাদি প্রেরণ বাংলাদেশের মধ্য দিয়াই সম্ভবপর। পাকিস্তান কর্তৃক প্রথম ভারত আক্রমণের পর হইতে এই জলপথ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর সম্প্রতি ইহা পুনরায় উন্মুক্ত হইয়াছে।

বিমানপথ: ঢাকা-চট্টগ্রাম বিমানপথ আছে এবং দক্ষিণের যশোহর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি বড় বড় শহরকে ইহা স্পর্শ করে। কলিকাতা হইতে ঢাকা পর্যন্ত নিয়মিত বিমান চলাচল করে।

আমদানী ও রপ্তানী: বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান রাষ্ট্র বলিয়া কাঁচা পাট, পাট নির্মিত দ্রব্য, তামাক, চা, পশুচর্ম, মৎস্য প্রভৃতি এখানকার

প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। ঔষধ, বস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, কয়লা, সিমেন্ট, লৌহ, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি ইহার প্রধান আমদানী দ্রব্যসম্ভার। সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নতির পথে এবং ইহা আশাব্যঞ্জক।

বিভাগ ও জেলা : বাংলাদেশে বর্তমানে তিনটি বিভাগ—(i) ঢাকা বিভাগ, (ii) রাজসাহী বিভাগ ও (iii) চট্টগ্রাম বিভাগ। ঢাকা বিভাগ—ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালি এই ছয়টি জেলা। রাজসাহী বিভাগ—রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, বগুরা, কুষ্টিয়া, যশোহর, খুলনা এই আটটি জেলা ; এবং চট্টগ্রাম বিভাগ—চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট এই পাঁচটি জেলা লইয়া গঠিত।

প্রধান শহর ও প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ : ঢাকা (লোকসংখ্যা প্রায় 7 লক্ষ)—বুড়ীগঙ্গার তীরে অবস্থিত প্রাচান নগর, রাষ্ট্রের রাজধানী ও প্রধান শহর। প্রাচীনকাল হইতেই সূক্ষ্ম বস্ত্র-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এক সময়ে ঢাকার মসলিন ইউরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সূক্ষ্ম সোনা-রূপার কাজ, শাঁখার কাজ এখানকার উল্লেখযোগ্য কুটীর-শিল্প। ঢাকায় দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ঢাকায় ঢাকেশ্বরীর মন্দির বিখ্যাত। ঢাকার অনতিদূরে তেজগাঁয়ে বিমান বন্দর অবস্থিত।

নারায়ণগঞ্জ—শীতলাক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত ষ্টীমার স্টেশন ও বিখ্যাত নদী-বন্দর এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। পাট ও বস্ত্র-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। **রাজসাহী**—পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত, বিভাগীয় শহর। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **কুষ্টিয়া**—জেলা শহর। এখানে কাপড়ের কল আছে। কুষ্টিয়ার অনতিদূরে পদ্মা-তীরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ কুঠীবাড়ী অবস্থিত। ইহার

সন্নিকটে কয়া গ্রামে বিপ্লবীনায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)-এর জন্মস্থান। কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি যশোহর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মভূমি। **খুলনা**—জেলা শহর। ভৈরব নদের তীরে রেল ও ষ্টীমার স্টেশন, উন্নতিশীল শহর। পাট, বস্ত্র, কাগজ, দিয়াশলাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিল্প। খুলনার নিকট **চালনা** বাংলাদেশের দ্বিতীয় বন্দর। যমুনা তীরে **জগন্নাথগঞ্জ** ও **সিরাজগঞ্জ**, পদ্মাতীরে **গোয়ালন্দ** এবং মেঘনাতীরে **চাঁদপুর** কয়েকটি বিখ্যাত নদী-বন্দর ও বাণিজ্যপ্রধান স্থান। **চট্টগ্রাম** (লোকসংখ্যা 3·64 লক্ষ)—সমুদ্র হইতে 16 কিলোমিটার (10 মাইল) অভ্যন্তরে কর্ণফুলী নদীতীরে অবস্থিত, বাংলাদেশের **প্রধান বন্দর**। পাট, চা, পশুচর্ম প্রভৃতি এই বন্দর দিয়া রপ্তানী হয়। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **রাঙ্গামাটি**—চট্টগ্রামের একটি স্বাস্থ্যকর শৈলনিবাস। **কুমিল্লা**—ত্রিপুরা জেলার প্রধান শহর ও ব্যবসায় কেন্দ্র; ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে জন্য বিখ্যাত। **শ্রীহট্ট**—জেলা শহর, সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত বাণিজ্যপ্রধান স্থান। কমলালেবু ও চা-এর জন্য প্রসিদ্ধ। **কক্সবাজার**—সমুদ্রতীরবর্তী স্বাস্থ্যকর স্থান।

প্রশ্নাবলী

(A)

1. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বিভাগগুলি উল্লেখপূর্বক উহাদের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

2. 'বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ।'—এই সম্বন্ধে তোমার মতামত উল্লেখ কর। পদ্মা নদীর গতিপথের পূর্ণ বিবরণ ও উহার তাৎপর্য বর্ণনা কর।

3. (ক) বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে ধান ও পাট উৎপন্ন হয়। ইহার কারণ নির্দেশ কর। (খ) বাংলাদেশে খনিজ দ্রব্যের অভাব কেন? (গ) চট্টগ্রাম বাংলাদেশের প্রধান বন্দর। ইহার গুরুত্ব বা তাৎপর্য আলোচনা কর।

4. বাংলাদেশের যাতায়াত ও পরিবহন-ব্যবস্থা সম্পর্কে সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা কর। বিভিন্ন প্রকার যাতায়াত-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

5. পশ্চিমবঙ্গের সহিত বাংলাদেশের জলবায়ুর তুলনামূলক আলোচনা কর।

6. নিম্নলিখিতগুলি কি এবং কিজন্য বিখ্যাত :

পার্বতীপুর, ঈশ্বরদি, নারায়ণগঞ্জ, গড়, সুরমা, রাঙ্গামাটি, সাগরদাঁড়ি, খুলনা, শ্রীহট্ট, চালনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী।

7. বাংলাদেশের একটি মানচিত্র অঙ্কন করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিতগুলি সন্নিবেশিত কর :

ঢাকা, দর্শনা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, গোয়ালন্দ, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম।

8. বাংলাদেশ ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী ও বন্ধুরাষ্ট্র। অবস্থান ও ব্যবসায়-বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ইহা আলোচনা কর।

(B)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী : Objective Tests

(নির্দেশ পূর্ববৎ)

1. Recall Type :

(i) বাংলাদেশ একটি প্রাচীন, সার্বভৌম —— রাষ্ট্র। ——

(ii) বাংলাদেশের প্রাচীন সমভূমি অঞ্চলকে সাধারণত: — বলে। ——

2. Completion Type :

প্রখ্যাত অধ্যাপক —— (1) —— (2) মতে
পদ্মা-যমুনা-মেঘনা পৃথিবীর —— (3) নদীস্রোত। —— (1)
ইহা যত —— (4) জল বহন করে, পৃথিবীর আর —— (2)
কোন নদীই তাহা করে না। অবশ্য ভৌগোলিক- —— (3)
দের —— মতে —— (5) পৃথিবীর বৃহত্তম নদ। (4)
—— (5)

3. Alternative Response Type :

(a) True or False Type :

(i) বাংলাদেশ পাট উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম। ——

(ii) চট্টগ্রাম একটি সমুদ্র বন্দর। ——

(iii) হার্ডিঞ্জ ব্রিজ যমুনার উপর নির্মিত। ——

(b) **Yes or No Type :**

(i) কলিকাতা হইতে কি বরাবর রেলপথে ঢাকা যাওয়া যায়? ——

(ii) বাংলাদেশের কি কোন সেচ পরিকল্পনা আছে? ——

(iii) বাংলাদেশের জলবায়ু কি চরম প্রকৃতির? ——

4. **Multiple Choice Type :**

(i) বাংলাদেশ ভারতের মত বিশ্ব রাজনীতিক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী। কারণ, ——

(a) বাংলাদেশ ভারতের বন্ধু,

(b) ঐ নীতি উন্নতিকামী দুর্বল রাষ্ট্রের পক্ষে সহায়ক,

(c) নিরপেক্ষ নীতি মানবতাধর্মের পরিপোষক,

(d) উপরোক্ত কোনটিই নহে।

(ii) বাংলাদেশ পৃথিবীতে পাট উৎপাদনে প্রথম। কারণ, ——

(a) বাংলাদেশের মৃত্তিকা উর্বর,

(b) মৌসুমী বায়ুপ্রবাহে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়,

(c) দেশের লোক কৃষিকার্যে পারদর্শী,

(d) উপরোক্ত প্রত্যেকটি কারণই দায়ী,

(e) উপরোক্ত কোন কারণই প্রযোজ্য নহে।
